আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টনবতিতম গ্রন্থ

আয়ুষ্মতী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করার সময় হ'তে এখনও
পর্য্যন্ত যাঁদের অযাচিত অনুগ্রহ আমি
পেয়ে আসছি, সেই সকল মহাত্মার
নামে এই বইখানি সাদরে
উৎসর্গ করলুম

খাঁটুরা পোঃ, গ্রাম,
জেঃ ২৪ পরগণা।
১৯৪৫

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আয়ুষ্মতী

১

"পবিত্র !—"

আহ্বানটী বড় গম্ভীরে, এত গম্ভীরে যে পবিত্র চমকাইয়া উঠিল, তাহার মুখখানা একেবারে শুকাইয়া উঠিল। উত্তর দেওয়া যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা তখন তাহার ভাবিবার অবকাশ ছিল না।

এই শান্ত সুন্দর জ্যোৎস্না-প্লাবিত যামিনীতে সে এরূপ আহ্বান শুনিবার জন্য মোটেই প্রস্তুত হয় নাই। নির্জ্জন চন্দ্রকরোজ্জ্বল ছাদের উপর সুদূর হইতে ভাসিয়া-আসা পাপিয়ার কলতান ও সুদূর হইতে বহিয়া-আসা বসন্ত-পবনের মদিরময় স্পর্শে সে আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কল্পনার চোখে সে কত কি দেখিতেছিল, কত মোহজাল আপনার চারিদিকে, প্রাণের ভিতর বুনিতেছিল, এই একটী কঠোর গম্ভীর আহ্বানে তাহার মনের মোহময়

তলা খসিয়া পড়িল, তাহার সোণার স্বপন টুটিয়া গেল, মোহজাল ছিঁড়িয়া গেল। নিমেষে তাহার চোখের সম্মুখ হইতে শুভ্র জ্যোৎস্না বিদূরিত হইয়া অন্ধকার সারা ধরাখানা যেন প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

অন্যায় তাহারই। সে তো জানে, তাহাকে এমনি কঠোর গম্ভীর আহ্বান এক দিন শুনিতে হইবে, বুকে কঠিন আঘাত লইতে হইবে। চাঁদের আলো, পাখীর সুর, এ সব শুধু কল্পনাতেই সাজে, বাস্তব জীবনে এ গুলি লইয়া মানুষ জীবন কাটাইতে পারে না। তাহাকে সংসারের নিষ্পেষণে পীড়িত হইতেই হইবে, এবং সেদিন পাখীর সুর তাহার কাণে অতি কটু বলিয়া অনুভূত হইবে, চাঁদ উঠিলেও চারিদিকে অন্ধকার বলিয়া তাহার ধারণা বদ্ধমূল থাকিয়া যাইবে।

হাঁ, যথার্থই অন্যায় তাহার; তাহার সম্মুখে ভীষণ বিপদ, মাথার উপর কি ভার বোঝা, তবুও সে চাঁদের আলো পাখীর গান উপভোগ করিতে চায়, তাও আবার মনপ্রাণ ঢালিয়া, একেবারে তাহার মাঝে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দিয়া। এ কি মূর্খতার কাজ নহে?

"পবিত্র!—"

না, আর এ ভাবে বসিয়া শুইয়া থাকা চলে না, ডাকের

পর ডাক আসিতেছে, তাহাকে সাড়া দিতেই হইবে। সকল জড়তা অপসারিত করিয়া সে উত্তর দিল "যাচ্ছি।"

কিন্তু চরণ চলিতে চায় না যে, সে যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। বিপদ আসিতেছে মনে করিয়াও দিন কাটানো যাইতে পারে, সে আসিবে নিশ্চিত, তাহা জানিয়া ব্যগ্র ভাবে না হয় চাহিয়া থাকিলে চলে। এ যে আসিয়াছে, এখন ইহাকে কোনও ক্রমে এড়াইয়া যাইতে পারিলেই যে বাচা চায়।

ভবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় একা গৃহে বসিয়া ধূমপানে নিযুক্ত। এটা একেবারেই অভাবনীয়, যেহেতু সারাদিন এবং রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত জমিদার মহাশয় বন্ধুহীন থাকিতেন না। পুত্রও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত না, কেন না দিন-রাতই তিনি "বড় ব্যস্ত" থাকিতেন। আজ তিনি একা অন্তঃপুরে একটী কক্ষে—এ কি আশ্চর্য্যের কথা নহে? তাঁহার মুখখানি অতিরিক্ত গম্ভীর, সে গম্ভীরতা তাঁহার আহ্বানে কতকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতেছিল, এমনি অবস্থায় পবিত্র গৃহপ্রবেশ করিল। তাহার সুগৌর মুখখানা তখন পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে, চোখ তুলিয়া পিতার পানে তাহার চাহিবার ক্ষমতা ছিল না।

যথার্থ-ই ভবশঙ্কর এমনি রাশভারি লোক ছিলেন। বড় একটা তিনি কথা বলিতেন না, পাছে মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার অগাধ গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া যাইত, কেবল একস্থানে—বন্ধুদের কাছে।

"এসেছ পবিত্র, এখানে বসো—কথা আছে।"

কি কথা তাহা পবিত্র জানিত। তাহার বুক কাঁপিতেছিল, ফরাসের একপার্শ্বে অতি কুণ্ঠিত ভাবে সে বসিয়া পড়িল।

ভবশঙ্কর অনেকক্ষণ নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। সে কলিকার তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, ভৃত্য আসিয়া আবার ছিলিম বদলাইয়া দিয়া গেল।

তামাক টানিতে টানিতে ভবশঙ্কর বলিলেন "এক-জামিন হয়ে গ্যাছে তোমার? কেমন দিলে?"

আজ পাঁচ সাত দিন পবিত্র বাড়ী আসিয়াছে, এ কয়দিন এ প্রশ্ন তাহাকে যে করিবেন, পিতার এ সময়টুকুও হইয়া উঠে নাই। পুত্রও প্রাণপণে বরাবর পিতাকে এড়াইয়া চলিত, কাজেই নিজে হইতে এ সংবাদটা পিতাকে দিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করে নাই।

নতমুখে সে উত্তর দিল "একজামিন ভালই দিয়েছি, সবাই বলছে ভাল হয়েছে, পাস হতে পারব।"

"হুঁ !" পিতা খানিক নীরব হইয়া রহিলেন, পবিত্রও তেমনি ভাবে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। শুধু যে এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই পিতা ডাকেন নাই, আরও যে কথা আছে তাহা সে জানিত, তাই তাহার বুকের মধ্যে মৃদু কম্পন চলিতেছিল।

পিতা গড়গড়াটা সরাইয়া রাখিলেন, গম্ভীর মুখে তেমনিই সুরে বলিলেন "একটা কথা তুমি এ পর্য্যন্ত আমায় জানাও নি, তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ কথাটা কি।"

পবিত্র নীরব।

ভবশঙ্কর গর্জ্জিয়া বলিলেন "উত্তর দাও—তুমি বিয়ে করেছ এ কথাটা কেন আমায় জানাও নি ? চুপ ক'রে রইলে যে, বল, উত্তর দাও।"

অপরাধী পুত্রের মুখে একটী কথাও সরিল না !

ক্রুর নয়নে পুত্রের দিকে চাহিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন, "আজকাল এমনই লায়েক ছেলে হয়েছ বটে, যে, কোন রকমেই আমায় আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চাও না। কিন্তু জানো, নিজেকে নিজে যোগ্য মনে করলেই যোগ্য হতে পারা যায় না, তুমি এখনও আমার হাতের মধ্যে আছ ?"

"দোষ করেছি বাবা—"

পবিত্র পিতার চরণতলে বসিয়া পড়িল, "আমায় মাপ করুন।" তাহার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মাতৃহীন সন্তান সে, চিরটা কাল যদিও সে দূরে দূরে আছে, তথাপি পিতার স্নেহ দৃষ্টি সর্ব্বদা তাহার উপর। একটীবার মাত্র সে দোষ করিয়াছে। মাপ চায়, এই কথাটা শুনিয়াই পিতার ক্রোধ কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল। তথাপি তিনি কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন "হাঁ, তুমি দোষ করেছ, আর এ দোষ বড় কম নয় যে, সামান্য মাপ করুন বললেই মিটে যাবে। তুমি জানো, আজ তুমি আমার বংশমর্য্যাদাকে নিতান্ত খেলার জিনিসের চোখে দেখেছ, আর তাকে নিয়ে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারও করেছ। লোকে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে, তবু নিজের মর্য্যাদা কিছুতেই বিসর্জ্জন দিতে পারে না। আর তুমি—তুমি কি না এত বড় বংশের একটী মাত্র ছেলে, আমার জীবদ্দশাতেই আমার মুখে, আমার পিতৃপুরুষের মুখে চূণকালী দিয়ে এলে?"

গভীর মর্ম্মবেদনায় তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। পবিত্র একবার চোখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিয়া তখনি নয়ন নত করিল।

ভবশঙ্কর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাক্,

এ জন্যে তোমায় এখন বেশী বলা মিছে, কারণ ব্যাপারটা এখন অতীতে মিশে গেছে। যাকে বিয়ে করেছ, তাকে কোথায় রেখে এসেছ ?"

অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে পবিত্র বলিল "সেখানে।"

"সেখানে কোথায়, কলকাতায় ?"

পবিত্র বলিল "হাঁ।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন, "এ কাজ তোমার উচিত হয়েছে কি ? আজ নয়, কাল সকালেই তোমায় যেতে হবে, তাকে আনতে হবে। এই দেখ, তোমার দাদাশ্বশুর আমায় পত্র দিয়েছেন, তাতেই আমি সব জানতে পেরেছি।"

কম্পিত হস্তে পবিত্র পত্রখানা গ্রহণ করিল।

পিতা গম্ভীর ভাবে বলিলেন "শোন, তোমাদের এখন তরুণ বয়েস, এ বয়সে প্রায়ই মানুষের হিতাহিত বিবেচনা শক্তি থাকে না, এ বয়সে তারা একটা রোখের বশে চলে থাকে। একদিন আমারও এ দিন ছিল, যেদিন রোখের বশে—থাক সে কথা ; তোমায় বলি, তুমি বিদ্বান্, বিদ্যার সার্থকতা যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের দ্বারা নিজের মনোবৃত্তিকে মার্জ্জিত করে তুলো, স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে যেয়ো না। আমি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক

করেছিলুম, তুমি আমার সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করে অপরিচিতা কোন একটা বালিকাকে জীবনের সঙ্গিনী করলে জানিনে। এও জানিনে তার এই বিবাহিত জীবনটার আগের ঘটনা কি, কে সে, কোথা হতে এসেছে, বা এর পরে তার কি ঘটতে পারে। খেয়ালের বশে তাকে সঙ্গিনী করলে, হয় তো এমনও হতে পারে, জানতে পারবে, সে—"

হঠাৎ থামিয়া গিয়া তিনি বলিলেন "না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমার জীবনটা যেন সুখময় হয়, দুঃখের কণামাত্র যেন তোমাকে বইতে না হয়। প্রথমটা আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু এখন আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি। যাও, তোমায় আর আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল সকালে তোমার যাওয়া চাইই, আমার পুত্রবধূর পাকস্পর্শ বিশেষ সমারোহের সঙ্গেই হবে।"

ধীরে ধীরে পবিত্র বাহির হইয়া গেল।

গমনশীল পুত্রের সুঠাম সুদীর্ঘ দেহের পানে চাহিয়া ভবশঙ্কর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতি বহুকাল পরে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

সে বড় কম দিনের কথা নয়, তেইশ বৎসর পূর্ব্বে ছয়মাসের শিশু পবিত্রকে রাখিয়া সাধ্বী সতী পতিব্রতা

পত্নী চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন। পবিত্রের ছোট মাসীমা উমা তখন মাত্র দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, বাল বিধবার আর কেহ না থাকায় দিদির সংসারেই থাকিতেন। এই মেয়েটী পবিত্রকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

নামে মাসীমা হইলেও পবিত্রের যথার্থ মা তিনিই। গর্ভধারিণী মা তাহাকে অতি শিশু রাখিয়া গিয়াছেন, উমা তাহাকে জগৎ চিনাইয়া দিলেন।

বাস্তবিক উমা ছিলেন বলিয়াই পবিত্র বাঁচিল, নচেৎ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় সেও চলিয়া যাইত।

আজও উমা এই সংসারের কর্ত্রী, পবিত্রের মাসীমা। উমার সুব্যবস্থায় সংসার যথাক্রমে চলিতেছে, নচেৎ এ সংসার বোধ হয় একটা দিনও থাকিত না, কোথা হইতে কি উড়িয়া যাইত, তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই।

২

পবিত্র যতটা প্রলয়কাণ্ডের আশা করিয়াছিল, ততটা হইল না, ইহাতে তাহার মনটা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বিবাহটা যথার্থই সে রোখের বশে করিয়া ফেলিয়াছিল।

পূরবী মেয়েটী দেখিতে সুন্দরী, কিন্তু তাহার পরিচয় সে কিছুই পায় নাই, পরিচয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতাও বোধ করে নাই। বন্ধুরা এই বিবাহ যাহাতে রহিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহার জেদ আরও বাড়িল বই কমিল না।

পূরবীর দাদামহাশয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কন্যাদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এ সংসারে পূরবীর সম্বল ছিল এই দাদামহাশয়টি, আর কেহই তাহার ছিল না। মা বাপ কবে যে অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সে কথা তাহার মনেই নাই। জ্ঞান হইয়া অবধি সে দাদামহাশয়কে দেখিয়া আসিতেছে, আর আপনার লোক কাহাকেও সে জানে না।

বিবাহের রাত্রে সে পূর্ণ দৃষ্টিতে পবিত্রের পানে চাহিল, তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, পবিত্রের অনিন্দ্য কান্তির মধ্যে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

বিবাহের পরদিনই পবিত্র চলিয়া গেল, যাইবার সময় সে বলিয়া গেল, সে পিতাকে সব কথা জানাইয়া পূরবীকে বাড়ী লইয়া যাইবে।

চারদিনের কথা সে বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু চারদিনের স্থানে দশ বার দিন চলিয়া গেল, তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না।

নাতনীর সিন্দুর শোভিত সীমন্তের পানে চাহিয়া বৃদ্ধ জলধর আর দীর্ঘনিঃশ্বাস রোধ করিতে পারেন না। অবশেষে তাহাকে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া, তিনি সব কথা খুলিয়া ক্ষমা চাহিয়া বেহাইকে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। সেই পত্রই ভবশঙ্করের হস্তগত হইয়াছিল।

পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না, কে জানে ঠিকানা ভুল হইল না তো।

"দিদি, ঠিকানাটা একবার দেখি, যেখানা পবিত্র দিয়ে গেছে তোকে।"

পূরবী তখন উনানে আগুন দিতেছিল, বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি দাদা?"

জলধর জিজ্ঞাসা করিলেন "পবিত্রের ঠিকানাটা তোর কাছে আছে না?"

পূরবীর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নিজের বাক্স হইতে পবিত্রের লেখা ঠিকানার কাগজখানা আনিয়া দাদামহাশয়ের হাতে দিয়া সরিয়া পড়িল।

পবিত্রের সহিত তাহার পবিত্র বিবাহ-বন্ধন, সে তো না হয় আজ কয়দিনের মাত্র, কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই পবিত্র তাহাদের পরিচিত। এই বৃদ্ধ দাদামহাশয় ও নাতনীটিকে পবিত্র বরাবরই অত্যন্ত দয়ার চোখে দেখিত,

এবং অনেককাল হইতে ইঁহাদের সাহায্যও করিয়া আসিতেছে। এই অসীম দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই সে পঞ্চদশ বর্ষীয়া পূরবীকে বিবাহ করিয়া বৃদ্ধকে দারুণ দায় হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

পূরবী উনানে আগুন দিতে দিতে পবিত্রের কথাই ভাবিতেছিল, আর তাহার দুইটী বড় বড় চোখ ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

নিষ্ঠুর—

কথাটা আপনা আপনি বলিয়া ফেলিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল। সে নিষ্ঠুর বলিতেছে কাহাকে,—পবিত্রকে? পবিত্র এ পর্য্যন্ত যে ব্যবহার তাহাদের সহিত করিয়াছে, তাহা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, না, অসীম দয়ার নিদর্শন? ছিঃ সে কাহাকে নিষ্ঠুর বলিতেছে,—যে দয়াবান, কৃপাবান তাহাকে?

স্বামীর মহত্ত্বের কথা ভাবিতে গিয়া কখন তাহার চোখের জল মিলাইয়া গেল, তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; সে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তিনি যে আমার দাদামশাইকে ভীষণ দায় হতে উদ্ধার করেছেন, আমার কুমারী নাম খণ্ডন করে সধবা নারী শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন ভগবান, তাঁর মঙ্গল

কর। তিনি আমায় গ্রহণ করুন বা না করুন, আমি যেন সারা জীবন কালের মধ্যে একটীবারের জন্যও তাঁর গুণগান করতে বিরত না হই।”

সন্ধ্যার পরে জ্যোৎস্নালোকিত ছাদের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে সে এই কথাই ভাবিতেছিল। কোন সুদূরে সেই পল্লীগ্রামখানি, তাহার চিরকাঙ্ক্ষিত স্বামী ভবন। আজ এমনি সময়ে এমনি শুভ্র চাঁদের আলোয় সে ভবনটী সিক্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মুক্ত বাতাস মুক্ত ভাবে বহিয়া যাইতেছে। গ্রামের উন্মুক্ত আকাশের তলে গাছের ঘন পাতার আড়ালে লুকাইয়া পাখী অবাধ গান গাহিতেছে। আর এই সুদূর কলিকাতায়—

“দিদি—দিদিমণি, পূরবী—”

“কি দাদা—”

দাদামহাশয় নিচে হইতে ডাকিলেন “এ দিকে আয় একবার, দেখে যা কে এসেছে।”

কে আসিয়াছে, স্বামী আসিয়াছেন কি? পূরবীর বুকটা পুলকাবেগে কাঁপিয়া উঠিল।

তখনই সে সে আবেগকে দমন করিয়া ফেলিল—না, তিনি কেন, তিনি নহেন। আর কেহ হয় তো আসিয়াছে, দাদু তাই ডাকিতেছেন।

নিচে নামিতেই সে দাদামহাশয়ের গৃহে আর একটী লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। এ স্বর তাহার চির-পরিচিত, বুকের মধ্যে স্তরে স্তরে এই স্বরই জমিয়া আছে।

পবিত্র ফিরিয়াছে। সে দয়াবান সে প্রতারণা করে নাই, একটী নারী-হৃদয় একেবারে ব্যর্থ করিয়া যায় নাই, সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল।

পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, "চারদিনের যায়গায় এতদিন হয়ে গেল, তুমি কি ভাবছিলে পূরবী ?"

পূরবী মাথা নাড়িয়া বলিল "কিছুই না।"

"কিছুই না বই কি ?" পবিত্র তাহার মুখখানা নাড়িয়া দিয়া বলিল "এটা তোমার একেবারে মিথ্যে কথা পূববী ; নিশ্চয়ই ভাবছিলে জুয়াচোর, ঠক, কেমন ?"

পূরবী তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "অমন কথা বলো না, মুখেও এন না। আমার ভাবনা কি বল। আমি কোথাকার কে, দরিদ্রা, নগণ্যা একটী নারী মাত্র, তুমি দয়া করে আমায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছ—"

"চুপ, চুপ, বড় বেশী বলে যাচ্ছ, পূরবী, তোমার চেয়ে তোমার কথাটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, সেটা মনে করে কথা বল।"

পূরবী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "পথের ধূলোকে আদর করে মাথায় যদি স্থান দাও, সে যে সেই ঘৃণ্য ধূলো মাত্র তা সে কিছুতেই ভুলবে না। আর সত্যিও সে কথা যে সে ধূলোই থাকবে, সোণার মত দ্যুতি ধরবার কিম্বা সোণার সমান মূল্যে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার কিছুতেই নেই। তুমি আমায় আদর করে গ্রহণ করলেই কি আমি ভুলে যাব—আমি কি? পথের ভিখারিণী হতে রাজরাণী হয়ে কি ভুলে যাব—আমি কি ছিলুম?"

ব্যগ্রকণ্ঠে পবিত্র বলিল, "যাক যাক, ও সব কথা ছেড়ে দাও। ধূলো আর স্বর্ণরেণুর তুলনা করবার জন্যে আমি বিশেষ ব্যস্ত নই, তা বোধ হয় জানছো। আর যদি সে তুলনা দিতে তুমি চাও, তবে আমায় অতটা উঁচু না করে নিচের পদবীতে ফেল। ধূলো রাজার মাথায় স্থান পায় না, কিন্তু রাজার শক্তি যে প্রজা, সেই প্রজা কৃষকের কাছে ধূলো কি রকম আদরের জিনিস তা বোধ হয় জান। কৃষক ধান তোলে, আবার প্রার্থনাও করে রাখে, আসছে বছর যেন এই ধূলো মাথায় গায়ে মেখে সে জীবন ধারণের সার্থকতা লাভ করতে পারে।

পূরবী শুধু জলভরা বড় বড় দুইটী চোখ মেলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল,—এত বড় মহান্ কথার

উপর তাহার তুচ্ছ কথা পাড়িবার সাহস আর তাহার হইল না।

পবিত্র বলিল "এখন আমার বাড়ীর কথা শুনবে পূরবী, না, ওই সব তুচ্ছ কথায় আপনাকে একেবারে মগ্ন করে রাখবে, বল ?"

ধীর কণ্ঠে পূরবী বলিল, "বাবা শুনেছেন ?"

পবিত্র বলিল, "দাদামশায়ের পত্রখানা তাঁকে সব কথা জানিয়ে দিয়েছে। এক রকম হল ভাল, কেন না, এ কথা যে কি করে আমি তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না। আমার সামনে যে কি বিপদ জাগছিল, তা বোধ হয় অনুভবে কতকটা বুঝতে পারবে পূরবী। বাবার বংশমর্য্যাদার জন্যেই আমার বড় ভয় ছিল, ভেবেছিলুম, তাঁর সেই বংশমর্য্যাদা আমার দ্বারা নষ্ট হল, তিনি কখনও এ সহ্য করবেন না ; কিন্তু বেশী আশ্চর্য্যের কথা—তিনি সহজেই এটা মেনে নিলেন।"

বিস্ময়ে পূরবী বলিল "মেনে নিলেন ?"

উৎসাহিত কণ্ঠে পবিত্র বলিল "নিলেন বই কি ? প্রথমটায় আমায় খানিকটে বকলেন, তার পর হুকুম দিলেন, আমায় আজ এখানে এসে তোমায় নিয়ে যেতে হবে। তোমার যে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, অত বড় একটা

সম্মাননীয় বংশের একমাত্র বধূ তুমি, এটা বিশেষ সমারোহের মধ্যে দিয়ে সব লোককে জানিয়ে দিতে হবে, এই তাঁর ইচ্ছা।"

আনন্দে পূরবীর চোখ দুইটী প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তবে তাহার স্বামিভবনে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছে। তাহার এতদিনকার প্রার্থনা নারায়ণের চরণোপান্তে, পৌছিয়াছে, তাহার প্রার্থনার ফল সে পাইয়াছে।

মনের আবেগে সে, সে রাত্রে কত কথাই বলিয়া ফেলিল ঠিক নাই, এত কথা সে জীবনে কখনও বলে নাই।

"দাদুকে বলেছ ?"

পবিত্র মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তাড়াতাড়িতে তোমায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারি নি। সকালে বলব এখন সে কথা।"

পরদিন সকালে পবিত্র জলধরের কাছে বলিল, "বাবা আপনার নাতনীকে নিয়ে যাবার জন্তে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বৃদ্ধ তখন একখানা অতি পুরাতন জীর্ণ খাতায় কি পড়িতেছিলেন, ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে, পূরবীকে ?"

পবিত্র উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

জলধর বলিলেন "তোমার বাবার মত হয়েছে? রাগ করেন নি, তুমি তাঁর অমতে বিয়ে করেছ শুনে?"

সংক্ষেপে পবিত্র উত্তর দিল "না।"

"ভারি খুসি হয়েছি শুনে। নিয়ে যাবে—আচ্ছা, তা নিয়ে যেয়ো, আমার তাতে আর কি আপত্তি থাকবে ভাই? তোমার জিনিস, তোমার যা ইচ্ছা তাই এখন করতে পার। এতটুকু বেলা হতে মানুষ করেছি, এই পনেরটা বছর আমারই কোলে মানুষ হয়েছে। প্রথমটার—তা একটু কষ্ট হয় বই কি। না,—তার আর কষ্টই বা কি—তবে—"

তাঁহার মলিন চোখ দুটি বুঝি ধীরে ধীরে অশ্রুপূরিত হইয়া উঠিতেছিল। মুখখানা আরও নিচু করিয়া তিনি ঝাঁ করিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বেশ তো, এর বেশী আনন্দের কথা আর কি থাকতে পারে, কেই বা আশা করতে পারে।" বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। এ হাসি যে কিসে তৈয়ারী, তাহা পবিত্র বুঝিয়াছিল, তাই সে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পূরবী চলিয়া যাইবে—বৃদ্ধ দাদামহাশয় ভারী ব্যস্ত। তাহার জন্য বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বাক্স, সাবান, কাপড়,

সেমিজ প্রভৃতি কিনিতেছিলেন, সিন্দুরের কৌটা কাঁটা চিরুনি প্রভৃতি কিছুই বাদ গেল না।

এই সব কিনিতেছিলেন আর থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল, পনের বৎসরের মধ্যে একটা দিন যাহাকে কোলছাড়া করেন নাই, সে আজ চলিয়া যাইতেছে ; কে জানে কতদিন বাদে সে ফিরিবে।

বেলা প্রায় বারটার সময়ে ঘর্ম্মসিক্ত দেহে হাঁফাইতে হাঁফাইতে জলধর দুজন কুলীর ঘাড়ে সওদা চাপাইয়া বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন।

ব্যস্ত পূরবী তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত হইতে বেশী গুটি কত জিনিস নামাইয়া লইয়া, তাঁহাকে বসাইয়া জিনিসপত্র সব গৃহে তুলিল। জলধর সহাস্যমুখে সবগুলি তাহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

অনর্থক এতগুলা টাকা ব্যয়ের কথা শুনিয়া পূরবী রাগ করিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদু, এত টাকা খরচ করে এই জিনিসপত্র কেনবার কি মানে ছিল ?"

দাদুর প্রফুল্ল মুখখানা নাতনীর এই তিরস্কারে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন "তুই চলে যাবি দিদি, একেবারে খালি হাতে,

সত্যিই একটা হাড়ি বাগদির মেয়ের মত উঠবি সেখানে, তাই এই গোটাকত জিনিস কিনে আনলুম। এমনই তো কপাল যে তোর হাতে শুধু কাঁচের চুড়ি দিয়েই পাঠাতে হচ্ছে, তা আর কি করব? সম্বলের মধ্যে আছে এই ছোট গুটি তিনেক ঘর নিয়ে ছোট বাড়ীখানা, আব পেনসান কুড়িটী টাকা মাসিক আয় মাত্র—"

রক্তিম মুখে পূরবী বলিল "তারই তো এই ষাট সত্তর খানেক টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে এলে দাদু। কুড়ি টাকা মাসিক আয় হতে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যা দুটি একটী টাকা সঞ্চয় করেছিলে, তা এমনি করেই ঘুচিয়ে দিলে; এর পর তোমার কি উপায় হবে বল তো?"

দাদা মহাশয় নিজের কেশশূন্য মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অস্ফুটে যেন আপনা আপনিই বলিলেন, আবার আসছে মাসে কুড়িটা টাকা তো পাব। একটা মানুষ মাত্র, আলু সিদ্ধ ভাত খেয়েই একটা বেলা কেটে যাবে, আর একটা বেলা—যা হয় কিছু খেয়ে—"

তাঁহার সেই মুখখানার পানে চাহিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া পূরবী চলিয়া গেল।

এমনি করিয়াই বৈকাল আসিয়া পড়িল, সন্ধ্যার ট্রেণে তাহারা যাইবে, এখনই বাহির হইতে হইবে।

দাদুকে বিদায় প্রণাম করিতে গিয়া পূরবী কাঁদিয়া আকুল হইল। অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দাদু তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন "কাঁদছিস কেন দিদি, মেয়েদের বাঞ্ছিত স্বামিগৃহে যাচ্ছিস, এ যে বড় সৌভাগ্যের কথা। প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি, যেন স্বামী গৃহেই তোর জীবন কেটে যায়, কোন দিনকার কলঙ্কের বাতাস তোর গায়ে এসে যেন না লাগতে পারে।

পূরবী উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিতে চাপিতে বলিল "তুমি সেখানে যাবে না দাদু ?"

পবিত্র পিছন হইতে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল "আপনি যাবেন দাদু, বউভাতের সময় বাবা আপনাকেও নিমন্ত্রণের চিঠি দেবেন।"

"যাব দাদু—নিমন্ত্রণ পেলেই যাব।"

বিদায় লইয়া তাহারা উভয়ে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, বৃদ্ধা শূন্যনয়নে চহিয়া রহিলেন। তাহার পর ফিরিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। সে দিন তিনি আর উঠিলেন না, রাত্রে আহারাদিও করিলেন না, তাঁহার প্রিয় হুকা কলিকা অনাস্বাদিত অবহেলিত পড়িয়া রহিল।

৩

নূতন বধূ আসিয়াছে, শুধু বাড়ীতে বলিয়া নয়, গ্রামেও একটা গোল উঠিয়াছে। এই বিস্ময়কর বিবাহ, বিস্ময়ের পাত্রী নববধূকে দেখিতে দলে দলে গ্রামের মেয়েরা আসা যাওয়া করিতেছে।

জমীদারের একটী মাত্র পুত্রের এরূপ গোপন বিবাহ আশ্চর্য্যের কথাই বটে।

রামময় মুখোপাধ্যায় তামাক টানিতে টানিতে মাথা দুলাইয়া বলিলেন "হুঁ, নিশ্চয়ই এর কোনও কারণ আছে, নইলে এমনটা হয়? এত গোপনে—গা ঢাকা দিয়ে বিয়ে; আচ্ছা রোসো, আমি সবই বের করে নিচ্ছি। যদি না পারি আমার নাম রামময় মুখুয্যেই নয়।

ভগবানের আশ্চর্য্য সৃজন এই পল্লীবাসী বৃদ্ধগুলা, ইহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে যথার্থই অনেক চিন্তা স্থান পায়, এবং ক্রমে বড় বৃক্ষরূপে পরিণত হয়।

রামময়ের এরূপ করিবার আরও কারণ ছিল। জমীদারের সহিত কয়েকটা মোকর্দ্দমায় হারিয়া গিয়া তাঁহার জমীদার-বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন এক দিন ছিল, যে দিন তিনি সমান চালে জমীদারের

সহিত চলিয়াছেন। শুনা যায়, দশ এগার পুরুষ পূর্ব্বে ইঁহাদের সব একই ছিল, দশ এগার পুরুষ মাঝে ব্যবধান, পুরুষানুক্রমিক বিবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে।

অদৃষ্টের বশে রামময় শেষ কালটায় ক্রমাগত হারিয়াই যাইতেছিলেন। যত হারিতেছিলেন ততই তাঁহার বিদ্বেষ বাড়িয়া চলিতেছিল। এখন তিনি ভবশঙ্করের সামান্য একটু ত্রুটি খুঁজিবার জন্য ব্যস্ত। যেরূপেই হোক, সকলের চোখে তাঁহাকে অপদস্থ করাই তাঁহার ইচ্ছা।

এই গোপন বিবাহের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য রামময় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন,—ভদ্রলোকের আহার নিদ্রা এককালে দূরীভূত হইয়া গেল বলিলেও চলে।

উমা পবিত্রের পত্নীকে পাইয়া যথার্থই বড় আনন্দিতা হইয়াছিলেন। সেই আনন্দের মধ্যে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল, স্বর্গগতা ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া নীরবে তিনি প্রণাম করিলেন।

পবিত্র ও পূরবীকে প্রথমেই তিনি ঠাকুর ঘরে লইয়া গিয়া প্রণাম করাইলেন। তাহার পর ভবশঙ্করের শয়ন কক্ষে উভয়কে লইয়া গিয়া, দেয়ালে বিলম্বিত মৃতা ভগিনীর ফটো দেখাইয়া, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এঁকে প্রণাম কর পবিত্র, তুমিও প্রণাম কর মা।"

পবিত্র বিদ্রোহীভাবে বলিল "কেন ?"

বিস্ময়ের সুরে উমা বলিলেন, "কেন আবার কি পাগলা ছেলে ? তোর মা যে, প্রণাম করবি নে ?"

পবিত্র উমার শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানার পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "এটা আমায় ভুল বুঝাচ্ছ মা। আমার মা একমাত্র তুমি, এ জগতে আর আমার কেউ মা নেই। ছবিকে আগে প্রণাম করে আমার কি তৃপ্তি হবে মা, আমি আগে তোমারই পায়ের ধূলো মাথায় দিই।"

নত হইয়া সে উমার পায়ের ধূলো তুলিয়া মাথায় দিল।

"আঃ ছি ছি বাবা, কি করিস, তার কিছু ঠিক নেই" বলিতে বলিতে উমা তাহার মুখখানা বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন. উদ্বেলিত অশ্রু আর মানা মানিল না, সকল মানা অতিক্রম করিয়া তাহা পবিত্রের মাথার উপর ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

"ওরে, আমি যে তোর মাসীমা, এই যে তোর মা, আমার দিদি। আচ্ছা পাগল, না হয় আমার বড় দিদি বলেই প্রণাম কর, তাতে তো কিছু তোর আসবে যাবে না।"

পবিত্র মাথা নাড়িয়া বলিল "না, তা আসবে যাবে

না। প্রণাম করছি, কিন্তু সেটা কেবল তোমার খাতিরে, তোমার বড় বোন বলে, আমার মা বলে নয়।” ’

সে প্রণাম করিল, পূরবীও প্রণাম করিল।

পুত্র ও পুত্রবধূ আসিয়াছে সংবাদ পাইয়াও ধীর প্রকৃতি ভবশঙ্কর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন না। মনটা চঞ্চল হইয়া নিশ্চয়ই উঠিয়াছিল, অবাধ্য মনকে তিরস্কার করিয়া ধীরে সুস্থে হাতের কাজ শেষ করিয়া ঠিক নিয়মিত সময়েই অন্তঃপুরে আসার জন্য ভবশঙ্কর গাত্রোত্থান করিলেন।

দেওয়ান বনমালী রায় বলিলেন “খোকাবাবু সেই ভোরবেলা বউমাকে নিয়ে এসেছেন, বেলা একটা বাজে, আপনার একবারও এর মধ্যে বউমাকে দেখার অবকাশ হল না বাবু?”

তাড়া দিয়া উঠিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “নিয়ে এসেছে ভালই, কাজ ফেলে রেখে আমাকেও যে ছেলেমানুষের মত বউ দেখতে ছুটতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বউ তো পালাচ্ছে না, হচ্ছে।”

তাড়া খাইয়া বৃদ্ধ বনমালী রায় আমতা আমতা করিয়া সরিয়া গেলেন। ছোট বেলা হইতে এই বৃদ্ধ এ সংসারে প্রতিপালিত, আজীবন তিনি কুমার, নারী মাত্রই তাঁহার মা। সকলে তাঁহাকে ক্ষেপাইত,—বিধাতা বনমালী রায়ের

অদৃষ্টে বিবাহ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কথাটা যথার্থই সত্য, তাই এই পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বনমালী রায় অবিবাহিত।

পবিত্র ছিল বনমালী রায়ের বড় প্রিয়। অন্তঃপুরে মাসীমা উমার কাছ হইতে সে মাতৃস্নেহ পাইয়াছিল, বাহিরে বনমালী রায়ের নিকট হইতে সে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়াছিল। পবিত্র যাহাতে দশটা লোকের মধ্যে একটা লোক হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, বনমালী রায়ের দৃষ্টি সেদিকে বড় তীক্ষ্ণ ছিল। সেই পবিত্র বিবাহ করিয়াছে, তাহার স্ত্রী আসিয়াছে, বনমালী রায়ের হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না।

আনন্দে অধীর তিনি—সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছিলেন, তাহাকেই এই সুসংবাদ দিতেছিলেন, পবিত্র বউ লইয়া আসিয়াছে। বলিতে গেলে তাঁহার দ্বারাই এ সংবাদটা সমস্ত গ্রামে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

গ্রামের লোক আসিয়া বউ দেখিয়া গেল, আর পবিত্রের যিনি পিতা, তিনি জমীদারির কাজে এত বিব্রত যে, পুত্রবধূর মুখখানা দেখিবার অবকাশ পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। বনমালী রায় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিলেন, মনের মধ্যে অনেক-গুলা কঠিন কথা স্তরে স্তরে জমা হইতেছিল, কিন্তু সব

কথা বলা হইল না, ভবশঙ্করের মুখ দেখিয়াই তাঁহাকে পলাইতে হইল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই ভবশঙ্কর পুত্রবধূর মুখ দেখিলেন। উমা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উৎসুকনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভবশঙ্কর একটী কথাও বলিলেন না, নিজের মত ব্যক্ত করিলেন না, মুখখানাও যেমন ছিল তেমনিই রহিয়া গেল, একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না। আশ্চর্য্য মানুষ যা হোক।

নিত্যকার মত আহারাদি শেষে একঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া ভবশঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাহিবে গিয়া বনমালী রায়কে ডাকিয়া বলিলেন, "কতকগুলো জিনিসপত্র কলকাতা হতে কিনে আনতে হবে তোমাকে, আর এখানে আসছে রবিবারে সমাজ খাওয়ানো হবে, তার বন্দোবস্ত কি করছ?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বনমালী বলিলেন, "আমি তো কিছুই করছিনে তার জন্যে।"

"কিছুই করছ না?" উগ্রস্বরে ভবশঙ্কর বলিলেন "বেশ লোক তুমি। আমার চেয়ে এ দিকে সব বিষয়ে তোমার বুদ্ধি বেশী, এটার বেলায় এ রকম কাঁচা কাজ করছ কেন? দেখছ, পবিত্র বিয়ে করে বউ নিয়ে এল। জানো, যদিও

চুপি চুপি সে বিয়ে করেছে, তবু যে মেয়েটী আমার পুত্রবধূ হয়েছে, তাকে এখন সমাজে পরিচিতা করে দেওয়া তার কাজ নয়, আমার কাজ। পাকস্পর্শ তো করতে হবে, যাতে লোকে জানতে পারবে, পবিত্রের বিয়ে হয়েছে। আর সেটা কিছু বেশী রকম সমারোহের মধ্যে দিয়েই করা আমার ইচ্ছে ; তাই আমি ভাবছি, শুধু খাওয়ালেই হবে না, সকলের হাতে একটা করে টাকা দেওয়া যাবে—আর সমাজের প্রত্যেক বাড়ীতে পবিত্রের বিয়ে উপলক্ষে ঘড়া থালা বাটী দিতে হবে, কেমন ?”

আনন্দে বনমালী রায়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, কিন্তু এ আনন্দ প্রকাশের স্থান নয়, তাহা হইলেই এখনই ছেলেমানুষ বলিয়া তাঁহাকে তাড়া খাইতে হইবে।

“যে আজ্ঞে। রামময় বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত—”

ভবশঙ্কর বলিলেন “নিশ্চয়ই। আসুন বা না আসুন, আমাদের নিমন্ত্রণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ। আমি এইবার সমাজসুদ্ধ লোকের নামের একটা তালিকা করি গিয়ে মুহুরীকে নিয়ে, আর তুমিও তোমার এ দিককার কাজ সেরে এসো আমার কাছে।”

ইহার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তালিকা প্রস্তুত হইয়া গেল, রামময় বাবুও বাদ পড়িলেন না।

সেই দিনই বনমাল রায় মহা আনন্দে জিনিসপত্রাদি কিনিতে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

৪

মাঝের কয়টা দিন গোলমালের মধ্য দিয়া ঝাঁ ঝাঁ করিয়া কাটিয়া গেল, রবিবার আসিয়া পড়িল।

সমাজের লোক জমীদার-বাড়ী নিমন্ত্রিত। বাড়ীতে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। দাদামহাশয়ও আজ প্রাতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার পূরবীর শ্বশুরালয়, রাজা শ্বশুর, এ সব দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরিতেছিল না। তিনি চারিদিক বেড়াইয়া দেখিতে-ছিলেন, অবসর মত বনমালীবাবু তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিতেছিলেন। উভয় বৃদ্ধতে মিলিয়া গিয়াছিল বেশ।

দুপুর বেলায় কর্ম্মশ্রান্ত বনমালী হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া জলধরের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। জলধর তখন তামাক টানিতে টানিতে প্রসন্ন মনে চারিদিকে চাহিতে-ছিলেন। একদিকে যত ভদ্রের সম্মিলন। পিছনের দরজায় রাজ্যের ভিখারী আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদের কোলাহলে পিছন দিকটাও পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আকাশে পাতলা মেঘ ভাসিয়া আসিয়াছে, ফাল্গুনের রৌদ্রতেজ তাই মন্দীভূত। বাহির বাটীতে বিশাল সামিয়ানার নিচে শত শত লোকের পাতা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বসিলেই হয়।

একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে চাহিয়া প্রফুল্ল মুখে জলধর জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সবই রাজাবাবুর প্রজা?"

সগর্ব্বে বনমালী হুঁকায় একটা টান দিয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই।"

এই নিশ্চয়ই কথাটার মধ্যে খানিকটা মিথ্যা কথা ছিল বই কি। কারণ, ইহার মধ্যে রামময় বাবুরও প্রজা আছে, একা ভবশঙ্করেরই নাই।

কিন্তু প্রভুর মর্য্যাদা বাড়াইতে বনমালী অনায়াসে গ্রামের পর গ্রামের নাম করিয়া চলিলেন, এবং সগর্ব্বে জানাইলেন, এ সবই তাঁহার প্রভুর জমিদারী।

আহার স্থানে পাতা পড়িয়াছিল, কিন্তু কেহই বসিল না—একস্থানে সমবেত হইয়া গোল পাকাইতে লাগিল। গোলমাল দেখিয়া বনমালী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "আপনি একটু বসুন, আমি দেখে আসি ব্যাপারখানা কি?"

যেখানে অনেক লোক জমা হইয়াছিল, বনমালী

দেখিলেন, তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া গম্ভীর মুখে রামময় বাবু।

"এ কি, আপনারা সব দাঁড়িয়ে রইলেন যে? পাতা হয়েছে, বসবেন চলুন; রামময় বাবু, আপনিও চলুন।"

গম্ভীর কণ্ঠে রামময় বাবু বলিলেন "আমি খেতে আসিনি।"

"খেতে আসেন নি!"

বনমালী একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন—"খেতে আসেন নি, তবে কি করতে এসেছেন?"

তেমনি সুরে রামময় বাবু বলিলেন "সমাজের এতগুলি লোকের যাতে জাতিপাত না হয়, যাতে তাঁদের জাত ধর্ম্ম অক্ষত অটুট থাকে, আমি তাই করতে এসেছি।"

"কিসে জাত ধর্ম্ম নষ্ট হবে রামময়, আমার বাড়ী খেলে?"

পিছন হইতে এই স্থির কথা শুনিয়া বনমালী সচকিতে ফিরিয়া দেখিলেন, পিছনে দাঁড়াইয়া ভবশঙ্কর, তাঁহার দুটি চক্ষু হইতে অগ্নি ঝরিয়া পড়িতেছে।

রামময় বাবু চোখ তুলিয়া সেই অগ্নিস্পর্শী চোখের উপর ঠিক রাখিলেন; সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনার বাড়ী খেলে লোকে জাত ধর্ম্ম হারাবে।"

ভবশঙ্কর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ সে কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "কিন্তু সমাজের এই সব লোকেরাই তো এই কয়েক মাস আগে পূজোর তিন দিন আমার বাড়ীতে খেয়েছে, তখন ওদের জাত ধর্ম্ম যায় নি ?"

স্থির ভাবে রামময় বাবু বলিলেন, "না তখন যায় নি, যাবার কথাও ছিল না। এখন যাবার কারণ হয়েছে, তাই কেউ খাবে না।"

"কি কারণ হয়েছে রামময় ?"

রামময় বলিলেন, "কারণ আপনার ছেলে এক বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে, তাই সমাজ জানতে পেরে আপনার বাড়ীর আহারাদি বর্জ্জন করতে চায়।"

"বেশ্যার মেয়ে ? রামময়, মুখ সামাল করো। ভদ্র লোকের মেয়ের নামে এ রকম অপবাদ, এ কখনই সহ্য হয় না।"

ভবশঙ্কর ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, উপস্থিত আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু রামময় বাবু দমিলেন না। ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "বিনা প্রমাণে আমি একজন ভদ্রকন্যার উপরে এই দোষারোপ করছিনে; আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ-বিসম্বাদ থাকতে পারে,

আপনার নির্দ্দোষ পুত্রবধূর সঙ্গে নেই, কিম্বা তা নিয়ে আপনাকে নির্য্যাচিত করতেও আসি নি। সত্য যা তাকে অনায়াসে সকল সময়েই সকলের সামনে প্রকাশ করতে পারা যায়। যথার্থ সাধুরা সত্যকে অন্যায়ের অনুরোধে কখনই চেপে রাখেন না, আর তা রাখতে গেলেও থাকে না। কারণ সত্যের জয় সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র। তার উপর হাজার মিথ্যার বোঝা চাপাও না কেন, ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মত সে প্রকাশ হয়ে উঠবেই।”

কথাগুলা শেষ করিয়া এই যথার্থ সাধু লোকটী একবার বিশাল গুম্ফে তা দিয়া লইলেন। তাঁহার উদার মুখখানা দেখিয়া সত্যই ভবশঙ্কর দমিয়া গেলেন, তাঁহার মুখখানা বিমর্ষ হইয়া উঠিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রামময়বাবু একবার তাঁহার মুখখানা দেখিয়া লইলেন. বলিলেন “আমি আজ তিন দিন হল এই কথাটা শুনেছি, ভেবেছিলুম আপনিও জানেন——”

দমিয়া পড়িয়া ও সর্পের মত গর্জ্জিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “আমি জানি, জেনে শুনে আমি—”

হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন, কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তে নরম

করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আজ তিন দিন তুমি জেনেছ, তবু এ খবরটা আমায় জানাও নি কেন রামময় ?"

রামময়বাবু অপ্রস্তুতের মত মুখখানা করিয়া বলিলেন "সেইটুকুই আমার অন্যায় হয়ে গেছে, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কি করে আমি জানাব বলুন ? আর আমাকেও তার পরেই সহরে যেতে হয়েছিল, আজ সকালে মাত্র ফিরে এসে শুনলুম সমাজ সুদ্ধ নিমন্ত্রণ, আমাকেও দয়া করে বাদ দেন নি। ভাবলুম—যাক্ নিমন্ত্রণ স্থলে গিয়েই সব বলা যাবে। তা বলে এত বড় একটা অনাচার যে সমাজের মধ্যে অনায়াসে চলে যাবে, তা কোন মতেই হতে পারে না। হিন্দুর জাত—এ কি বড় মুখের কথা ? হিন্দুর আর আছে কি ? একে একে সে সবই বিসর্জ্জন দিয়েছে, জাতটাকে শুধু আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। এ জাত যদি যায় তবে হিন্দুর সব গেল। আর হিন্দু বলে পরিচয় দেবার মুখ তার আর রইল না। জাত— কি জানেন মশাই, বড় ঠুনকো জিনিস, যেন কাঁচের বাসন। লোহার মত শক্ত হলে ভাঙ্গবার ভয় থাকত না, যা খুসি অনাচার এর মধ্যে চালালেও চলতে পারত, কি বলুন ?"

তিনি যতক্ষণ জাতির মর্য্যাদা প্রকাশ করিতেছিলেন,

ভবশঙ্কর ততক্ষণ রাগে জ্বলিয়া যাইতেছিলেন। রামময়ের সংসারের কথা তাঁহার কাছে গোপন ছিল না। নির্ব্বিষ খোলস পৈতাখানা গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়া, সমাজের চোখে বংশমর্য্যাদা জাতি গর্ব্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া যত কিছু ব্যভিচাব সবই তিনি অনায়াসে করিয়া যাইতেন, কিছুই বাধিত না। আজ সে সব কথা ভবশঙ্কর বলিতে পারিতেন, কিন্তু বলিবার মত সময় এ তো নয়। তাঁহার নিজের গৃহের কলঙ্ক যে এ, তিনি যে একটী কথা বলারও অধিকার আজ হারাইয়াছেন।

সকলের মুখের পানে তিনি একবার চাহিলেন। নিমন্ত্রিতদের উদরে প্রবল ক্ষুধা, তাহারা আহারার্থ আসিয়াছে, ক্ষুধিত তৃষিত নেত্রে তাহারা পাতার পানে চাহিতেছে, তবু উদরের প্রবল ক্ষুধা, বক্ষের প্রবল তৃষ্ণা চাপিয়াও তাহারা মাথা দুলাইয়া বলিতেছে, "হ্যাঁ, এ ঠিক কথাই বটে। জাত—বাপরে, আমাদের আর আছে কি? জাত যদি যায়, আমরা তবে বেঁচে মরে থাকব যে!"

"হ্যাঁ, এ যথার্থ সত্য কথাই বটে। হিন্দুর আর কিছু নাই, গর্ব্ব করিবার মত যাহা কিছু ছিল, সবই তাহারা হারাইয়াছে, তাহারা এখন আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে

এই জাতিটাকে। এত বড় ব্যভিচার—ভাবিবার কথা নয় কি ?"

ভবশঙ্কর খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষটা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "পবিত্র যাকে বিয়ে করে এনেছে, সে যে যথার্থ বেশ্যার মেয়ে সে প্রমাণ তুমি আমায় দিতে পারবে ?"

রামময় বাবু বলিলেন "নিশ্চয়ই পারব। আপনি শোনা কথায় বিশ্বাস করতে চান না, এ তো ভাল কথা। পবিত্রের দাদাশ্বশুর শুনছি এসেছেন, তাঁকে ডাকুন, সকলের সামনে তিনি নিশ্চয়ই এ কথা গোপন করে রাখতে পারবেন না।"

"সেই ভাল কথা—"

ভবশঙ্কর পিছন ফিরিতেই দেখিতে পাইলেন, পবিত্রকে। সে প্রস্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, তাহার বুকের রক্ত জমিয়া আসিয়াছিল। আজ তাহার চির গর্ব্বিত, চিরমান্য পিতা সমাজের চোখে এরূপ অবমানিত হইলেন, ইহার কারণ কি সেই নয় ?

"পবিত্র—"

পিতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "যা—তোর আদরের দাদা-শ্বশুরকে ডেকে আন।"

ধীরে ধীরে পবিত্র সরিয়া গেল, ভবশঙ্কর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন—“অপদার্থ—” এই কথাটী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত তাঁহাব মুখ হইতে বাহির হইল।

জলধরের আগমন পথের পানে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। গৃহদেবতা দামোদর—আজিকার এই দারুণ অপমান হইতে তোমার চির-সেবককে রক্ষা কর। বৃদ্ধ যেন একেবারেই অস্বীকার করে, রামময়ের এ কথা সর্ব্বথা মিথ্যা হোক; ভগবান, তোমার চির-সেবককে এ অপমান অবহেলা হইতে বাঁচাও।

জনতার মধ্যে তখনও মৃদু গুঞ্জন উঠিতেছিল, মাঝখানে দাঁড়াইয়া রামময় বাবু। তাঁহার মুখখানি পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুটী দীপ্ত।

ধীরে ধীরে জলধর আসিয়া ভবশঙ্করের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তিনি পবিত্রের মুখে অল্প দুচার কথায় ব্যাপারটা কতক শুনিয়াছেন মাত্র, বিশ্বের কালিমা তাঁহার মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, চলিতে গিয়া পা দুখানা থর থর কাঁপিতেছিল। কতক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন, ঘৃণায় দুঃখে লজ্জায় ভবশঙ্কর একটা কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না।

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "ব্যাপারটা শুনতে পেয়েছেন ?"

জলধর উত্তর দিতে গেলেন, কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল—"হ্যাঁ।"

"এর বিরুদ্ধে কোনও কথা আপনার বলবার আছে কি ? আমি আপনাদের অপরিচিত, একটীবার মাত্র আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আপনার নাতনির সঙ্গেও তাই। পবিত্রও আপনাদের পরিচয় বিশেষ জানে না ; ছেলে মানুষ সে, খেয়ালের ঝোঁকে আমায় কিছু না জানিয়েই বিয়ে করেছে। আপনাদের কৈফিয়ৎ আপনাদেরই দিতে হবে, আমরা দিতে পারব না।"

একটু থামিয়া বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন "শুধু আমারই নয়, পবিত্রেরও মান সম্ভ্রম মর্য্যাদা আপনার একটী কথার 'পরে নির্ভর করছে। সমাজের চোখে এখন একেবারেই ঘৃণ্য হতে পারি—শুধু আপনার একটী কথায়। বলুন, উত্তর দিন—"

জলধর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। পৃথিবী তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তখন গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন, ভবশঙ্করের কথা কাণে আসিতেছিল, চোখে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না।

তাঁহার ভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধ ভবশঙ্কর বলিলেন "বলুন—উত্তর দিন, আপনার নাতনি যথার্থ বেশ্যাগর্ভজাতা কিনা ? বলুন সে—"

বিস্ফারিত নেত্রে জলধর শুধু তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

অস্থির ভবশঙ্কর তাঁহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "এখনও চুপ করে দেখছেন কি ? বলুন, সত্য যা তাকে ব্যক্ত করে দিন। বলুন—সে আপনার মেয়ের সন্তান, আপনার মেয়ে—"

"হ্যাঁ—সে পতিতার গর্ভজাতা, আমার মেয়ে—"

"হতভাগ্য—নরাধম !"

ভবশঙ্কর এত জোরে জলধরের হাতখানা ছুড়িয়া ফেলিলেন যে জলধর সে বেগ সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন।

জনতার পানে ফিরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিলেন "যথার্থ কথা এ। রামময়, আমার জিনিস পত্র নষ্ট হল, হোক, আমার অনেক অর্থ অপব্যয় হল—তাও হোক, আজ আমার পরম বন্ধুর কাজ করেছ তুমি, আমায় এত-গুলি লোকের জাতিপাতরূপ মহাপাতক হতে রক্ষা করেছ। ভগবান আছেন, নইলে আজ যথার্থ আমার সর্ব্বনাশ হত ;

এতবড় একটা পাপ আমার দ্বারাই সমাজে আজ চলন হয়ে যেত।”

একবার জলধরের পানে তীব্র জ্বলন্ত চোখে চাহিয়া দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন। জনতাও ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া পড়িল। খাওয়া না হোক, জাতি তো বাঁচিয়া গেল, উদরে প্রবল ক্ষুধার তাড়না সত্ত্বেও সকলেই এ কথা মানিয়া লইল।

৫

নির্জ্জন গৃহের মধ্যে পড়িয়া মুহ্যমানা পূরবী, পার্শ্বে বসিয়া বৃদ্ধ জলধর।

আজ সান্ত্বনার এমন কোনও ভাষা নাই, যাহা জলধর তাঁহার এই কাতরা নাতনীটির হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে পারেন। তিনি তাহার হৃদয়খানা নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিলেন, তাই তিনিও আজ এ মুহূর্ত্তে নির্ব্বাক্।

নিজের হাতে তিনি আজ তাঁহার বড় আদরের নাতনীর সর্ব্বনাশ করিলেন, তাহার আশ্রয় ঘুচাইলেন। ইহার বেশী যন্ত্রণা আর কিসে থাকিতে পারে, এ অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি হইতে পারে? জগতে পূরবী ছাড়া তাঁহার আর আছে কি?

কিন্তু তথাপি তিনি তো এ জীবন্ত সত্যকে গোপন রাখিতে পারিলেন না। তিনি তো জানিতেনই এ ঘটনা একদিন ঘটিতে পারে, তাঁহার পূরবী একটীমাত্র কথায় রাজরাণী হইতে পথের ভিখারিণীরও অধমা হইতে পারে। পবিত্র যখন তাঁহাকে ডাকিতে গেল, তখন তিনি তাহার মুখে সামান্য দুই একটা কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আজ সেই প্রতি মুহূর্ত্তের অপেক্ষিত দিনটী আসিয়াছে। এ দিনে পিছাইয়া গেলেও যে ফল, অগ্রসর হইলেও সেই ফল। যে সত্য ভস্মাচ্ছাদিত ছিল, একবার মাত্র নাড়া পাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা সেই ভস্মকেও নিজের রূপ দান করিয়া ফেলিয়াছে, মিথ্যা সত্যের স্পর্শে জীবন্ত সত্যরূপেই বিকাশ পাইয়াছে। ইহাকে এখন কি দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায়? লৌহ পর্য্যন্ত ইহার শক্তিতে বিগলিত হইয়া পড়িবে যে।

তিনি গোপন করিতে পারিলেন না. এই অবশ্য প্রকাশ্য কথার উপর আর কথা বলা সাজিবে না বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলেন, হাঁ, সে তাহাই, যাহা লোকে বলিতেছে।

পূরবীর পরবর্ত্তী অবস্থার কথা যখন মোটামুটি ভাবেই ধরিয়াছিলেন, তাহা যে এতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণাতেও আসে নাই।

সারাদিন পূরবী আজ জলস্পর্শ করে নাই। বধূবেশ তখনও তাহার দেহে, যে মুহূর্ত্তে এই ভয়ানক কথাটা কাণে আসিল, তাহার চারিপাশের মেয়েরা যখন ঘৃণার সহিত পতিতার মেয়ে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখনই সে বাতাহত কদলীর প্রায় লুটাইয়া পড়িল। তার পর কখন দাদামহাশয় আসিয়া পার্শ্বে বসিয়াছেন, সে তাহার কিছুই অবগত নয়।

অত বড় বাড়ীখানা—অত গোলমাল সব নীরব; বাড়ীতে যে মানুষ আছে, তাহাও জানা যাইতেছে না। ঐন্দ্রজালিকের কুহকময় দণ্ডস্পর্শে মুহূর্ত্তে কোলাহল মুখরিত সৌধ যেন নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

দাস দাসীগণ এঘর ওঘর করিতেছে, অতি সন্তর্পণে যেন কে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, একটু শব্দ হইলেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। ভবশঙ্কর সেই দুপুর হইতে উপরের ঘরে গিয়া দ্বার-রুদ্ধ করিয়াছেন, পবিত্র কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আজকার এই কাণ্ডের সেই যে মূল, তাহাতে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। উমা ঠাকুর-গৃহে পড়িয়া ছিলেন, বার-বার মাথা খুঁড়িতে-ছিলেন, তাঁহার আর্ত্ত স্বরটা এক একবার কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল—ঠাকুর, এ কাহার পাপে?

যাহারই পাপে হোক, উমার মনে হইতেছিল, এই সময়টায় পবিত্রের মা যে নাই এ ভালই হইয়াছে। তাঁহার বুকে যে আঘাত লাগিয়াছে, পবিত্রের মায়ের বুকে যে ইহার চেয়েও বেশী আঘাত লাগিত এই তাঁহার ধারণা। অন্য সময় তিনি স্বর্গগতা ভগিনীর জন্য শোক করিলেও এই সময়টা প্রাণ ভরিয়া বলিয়া উঠিলেন "বেশ করেছ ঠাকুর, দিদিকে তুমি নিয়েছ, কিন্তু আমায় কেন এর আগে নিলে না দেব, তা হলে আমাকেও তো আজ এ জ্বালা সইতে হত না।"

সকলের চেয়ে বেশী মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে কাহার? পূরবী ভাবিতেছে আমি গিয়াছি, একেবারেই মরিয়াছি; আর যে তাহাকে জীবনাপেক্ষা ভালবাসে, সে ভাবিতেছে আমিই আমাকে হত্যা করিলাম, নারায়ণ, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার বাহির আচ্ছন্ন করিবার আগে গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বাহিরে তরল অন্ধকার ক্রমে যত গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল, গৃহের অন্ধকার তত বেশী বাড়িতে লাগিল।

"মাগো—মা—"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করিয়াই

পূরবী চমকাইয়া উঠিল—হা ভগবান, এ শব্দটা মুখে আনিবার চেয়ে না আনাই যে ভাল। কে তাহার মা, পতিতা একটী নারী, যে নিজের দেহ বিক্রয় করিয়া—

"নারায়ণ," আর্ত্তভাবে অভাগিনী কাঁদিয়া উঠিল, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধন হতে আমায় বঞ্চিতা করলে প্রভু? যাকে দেখিনি যাকে তোমার উপরে স্থান দিয়েছি, তাকে এমন করে আমার চোখের সামনে আঁকলে? আমার মা বলে ডাকবার অধিকারটুকু দিলে না গো?"

মৎস্যকে জল হইতে স্থলে তুলিলে সে যেমন করিয়া আছড়াইতে থাকে, মাতৃনাম-বিচ্যুতা পূরবীও তেমনি ছটফট করিতে লাগিল; নির্জ্জল চক্ষে বসিয়া দাদামহাশয় দেখিতে লাগিলেন, তথাপি মুখ ফুটিয়া একটা সান্ত্বনার বাণী তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ ছটফট করিয়া হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল, দুই হাতে দাদামহাশয়ের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া উন্মাদিনীর মত বলিল "দাদামশাই—দাদামশাই, সত্যি কথা বল, সত্যি বল, আমার মা, তোমার মেয়ে, সত্যিই সে পতিতা একটী নারী ছিল? সেই পতিতা নারী—যারে দেখলে ঘৃণায় লোকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাদের ইহলোক আছে পরলোক নেই, যারা এই দেহটাকে কেনা-বেচার

জিনিস মনে করে—দাদামশাই, বল দাদামশাই, আমার মা যার অদেখা মূর্ত্তিটাকে মনের মধ্যে কল্পনা করে নিয়ে আমি সতীরাণী দুর্গা-মূর্ত্তিকে দেখেছি, আমার সেই মা—সে মা নয়, মেয়ে নয়, বোন নয়, সে পতিতা—সে ঘৃণ্য পতিতা নারী মাত্র। দাদামশাই, আজ আমায় ভুলিয়ো না, জগতের সামনে যার নগ্নমূর্ত্তি বেরিয়ে পড়েছে, আমার সামনে তাকে ঢাকতে চেয়ো না, জগতের চোখে যে পতিতা মূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়েছে, আমার সামনে তাকে সতীমূর্ত্তিতে প্রকাশ করতে চেয়ো না; সত্যি বল দাদা-মশাই তোমার পায়ে পড়ি, সত্যি বল সে যথার্থ কি—"

"সে যথার্থ ই তাই দিদি, সে মহিমময়ী সতী নয়, সে নরকের প্রেতিনী, সে রাক্ষসী।"

হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া পূরবী দাদামশায়ের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল "তবে কেন দাদামশাই, সব জেনে শুনে পতিতার মেয়ের বিয়ে দিলে কেন? যদি বিয়ে না দিতে—তবে আজ এমন করে তোমার মেয়ের আমার মায়ের কলঙ্ক জগতে প্রকাশ হতো না, মা বলে ডাকতে গিয়ে এরকম যন্ত্রণায় আমার বুকটা ছিঁড়ে পড়ত না। আমায় এনে এঁদেরও অপমান সইতে হত না। তুমি কি করলে দাদামশাই, পতিতার

মেয়ের বিয়ে দিয়ে সবদিকে আগুন ধরিয়ে দিলে যে। এ আগুনে আমিই যে আজীবনকাল জ্বলে মরব দাদামশাই! তোমার পূরবীকে তুমি বড় ভালবাস বলেই কি তাকে এমনি করে বেড়া আগুনে ফেললে গো?”

“দিদি আমার” চোখের জল বৃদ্ধ আর চাপিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। “বুঝতে পারি নি দিদি, মুহূর্ত্তের জন্যে আপনহারা হয়ে গেছলুম! এত দিন অনেক আগেই যে তোর বিয়ে হয়ে যেত পূরবী, অনেক পাত্রই তো এসেছিল; মনে তখনও এ জ্ঞানটা জেগে ছিল, তাই তাদের সব ফিরিয়ে দিলুম। পবিত্রকে ফিরাতে পারলুম না, ভাবলুম, আর কেন? তোর জীবনটাকে সুখময় করবার লোভ আমি সামলাতে পারলুম না, তোর বিয়ে দিলুম।

দাদামহাশয়ের বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া পূরবী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে নিজেই শান্ত হইল। মুখখানা তুলিয়া, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, “দাদামশাই, একবার বলো সে কথা—আমার পাপিনী মায়ের কথা, তুমি তো সবই জানো।”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জলধর বলিলেন, “জানি দিদি, সব কথা তোকে একদিন বলব ভেবেছিলুম। তার পর

তুই নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করতিস, ভগবানের ইচ্ছায় তা হল না।”

“আঃ, তা যদি বলতে দাদামশাই, কক্ষনো আমি বিয়ে করতুম না।”

দুই হাতে সে মাথা টিপিয়া ধরিল, হৃদয়ের উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত করিয়া বলিল “বল দাদামশাই।”

তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে দাদামহাশয় বলিলেন, “সে কথা এখন শুনবি দিদি? হ্যাঁ, এখনই শোন, এখনই এই অপমানের মধ্যে দিয়েই সেটা শুনে নে। তোর দিদিমা তোর মা বিধবা হওয়ার পরেই মারা যায়। বিধবা মেয়ে তারাকে আমি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম, কেউ যেন তার নাগাল না পায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাকে আটক করে রাখতে পারলুম না। একটা রাতের ভোরে আমি ঘুম হতে উঠে আর তাকে দেখতে পেলুম না।

কোথায় গেল সে, খুঁজে খুঁজে কোথাও তার দেখা পেলুম না, অবশেষে আমি আশা ছেড়ে দিয়ে বসলুম, জানলুম সে মরে গেছে, সে আর নেই।

বছর আট নয় পরে তার খোঁজ পেলুম। অভাগিনী ব্যারামে পড়ে আমায় খবর দিয়ে পাঠিয়েছে, একবার শেষ

দেখা দেখবার জন্যে। তার সুখের সাথীরা তখন তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে, তার আর কেউ তখন নেই যে তার মুখে একফোঁটা জল দেয়।

কিছুতেই থাকতে পারলুম না। ভাবলুম, যাব না, সে কলঙ্কিনীর মুখ আর দেখব না, কিন্তু থাকতে পারলুম কই? স্নেহ যে নিম্নগামী, নদীর স্রোত যেমন বয়েই যায়, ফেরে না, এই স্নেহও তেমনি একটানা চলেছে, এ আর ফেরে না। থাকতে পারলুম না বলেই বেরিয়ে পড়লুম।

গিয়ে দেখলুম, সত্যই তার দুর্দ্দশা তখন চরম সীমায় দাঁড়িয়েছে। সে একখানা খোলার ঘরের বারাণ্ডায় মাটীর ওপরে পড়ে আছে, মৃত্যুর কালিমা তার সারা মুখখানায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সে, একদৃষ্টে পথের পানে চেয়ে, তার মাথার কাছে বসে একটি দু'বছরের শিশু, মাগো, মাগো বলে কাঁদছে।

হা অভাগিনী, আমার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ভেবেছিলুম, ক্ষমা করব না, কিন্তু ক্ষমা করলুম, তার মাথা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলুম।

সে কিছুতেই মরতে পারছিল না, মেয়েটিকে কার কাছে সে দিয়ে যাবে, কে তার এই পাপের চিহ্ন গ্রহণ

করবে ? কেউ যে নিতে চায় না। পতিতা কেউ কেউ মেয়েটীকে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজে যে পথে এসেছিল, তা সে বুঝেছিল, তাই মেয়েটী যাতে সে পথে না আসে, মরতে গিয়েও সেদিকে তার দৃষ্টি ছিল। না, সে কিছুতেই তার মেয়েকে এ নরকে দেবে না, তার মেয়েকে সে বাঁচিয়ে যাবে। নিজের ইহ পরকাল সে নষ্ট করেছে, সে বুঝেছে নরক কি।

আমার হাতে মেয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোখ মুদলে। সে মেয়ে কে দিদি, তাও কি বলতে হবে, সে মেয়ে তুই,—সে তুই পূরবী।

আর্ত্তভাবে পূরবী বলিয়া উঠিল "দাদা, দাদামশাই—"

দাদামহাশয় ও নাতনী উভয়ের চোখের জলে বুক ভাসিতে লাগিল।

বাহিরে খটাখট খড়মের শব্দ শুনা গেল, পরমুহূর্ত্তেই ভবশঙ্করের গম্ভীর কথা ভাসিয়া আসিল "পবিত্র—"

পবিত্র বাড়ীর সীমানাতেও ছিল না।

"উমা—"

ঠাকুর ঘর হইতে উমা উত্তর দিলেন।

"উমা, সেই বেশ্যাকন্যা আর তার দাদামশাই কি এখনও আমার বাড়ীতে আছে ? আমার পবিত্র

পিতৃভিটে কি এখনও তাদের পাদস্পর্শে কলঙ্কিত হচ্ছে?"

ত্রস্তকণ্ঠে উমা বলিলেন "দেখি নি দাদামণি।"

ভবশঙ্কর গর্জ্জিয়া বলিলেন "যদি থাকে—এখনই বার হয়ে যেতে বল, এই রাত নটায় একখানা ট্রেণ আছে কলকাতায় যাবার। ঝিকে বলে দাও দেওয়ানকে বলতে, যেন একখানা পাল্কী এখনই ঠিক করে দেয়। এখনই যাওয়া চাই, নইলে—"

"দাদামশাই—" পূরবী উচ্ছ্বসিতা হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরা একটা দিনও আমাদের এখানে থাকতে দেবে না।"

অন্ধকার গৃহে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। দাদামশাই সেই অন্ধকারেই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তা তো দেবেই না দিদি। ওদের সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্কই যে চুকে গেল।"

"সব গেল দাদামশাই, সব গেল—"

পূরবী শুধু ফুলিতে লাগিল, চোখে আর জল আসিতে ছিল না।

ভেজানো দরজার একটু ফাঁক দিয়া আলোক রেখা আসিয়া গৃহমধ্যে পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলিয়া গেল, একটী লণ্ঠন হস্তে দরজায় দাঁড়াইয়া উমা।

"বউ মা—"

মুহূর্ত্তে পূরবী আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল; না, ইহাদের কাছে কিছুতেই দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হইবে না, এখন শক্ত হইতে হইবে—বুক পাষাণে বাঁধিতে হইবে।

· সে উত্তর দিল না, বউ মা আহ্বান—এ যে বিদ্রূপ মাত্র। সে তো বউমা নয়, এ বাড়ীর সঙ্গে তাহার আর সম্পর্ক কিসের।

উমা ডাকিলেন "পূরবী—"

"কেন" বড় ক্ষীণকণ্ঠে পূরবী উত্তর দিল।

"এ দিকে এসো মা, একটা কথা শোন।"

রুদ্ধ কণ্ঠে পূরবী বলিল "আমি সবই শুনেছি মা, আপনি পাল্কী আনতে আদেশ দিন, আমি চলে যাচ্ছি। আপনাদের এই গহনা গুলো—"

গহনাগুলা সে খুলিয়া পার্শ্বে রাখিয়াছিল; কাপড জামা ইহারই মধ্যে খোলা হইয়া গিয়াছে; সেই কাপড়ের উপর গহনাগুলা তুলিয়া সে উমার পায়ের কাছে রাখিল।

এ দৃশ্যে উমার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল, খানিকক্ষণ তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন "কেন মা, এ সব গা হতে খুলেছ?"

স্থির কণ্ঠে পূরবী বলিল, "এসবে আর আমার কি অধিকার আছে মা, আমার সব সম্পর্কই যখন উঠে গেল, আমি যখন এক নিমেষে সব হারালুম, মিথ্যে এ ভার বইবার আর কি দরকার আমার মা? আমি তো আর আপনাদের কেউ নই। বাড়ীর দাসীরও যে অধিকার আছে, আমার—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণে অসমর্থা উমা আলোটা ধপ করিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইলেন।

খিড়কীর দরজায় আসিয়া পাল্কী দাঁড়াইল; ভবশঙ্কর উপরের বারাণ্ডা হইতে গুরুগম্ভীর স্বরে ডাকিয়া আদেশ দিলেন "উমা, ওদের যা যা জিনিস আছে, নিয়ে চলে যেতে বলে দাও, পাল্কী এসেছে।"

টিনের বাক্সটা বাড়ীর ভৃত্য বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের কম্পিত হাতখানা শক্ত করিয়া ধরিয়া পূরবী অগ্রসর হইল। যাইবার সময় একবার উমার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল, একবার পবিত্রের পা দুখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুই হইল না।

অন্ধকার ভেদ করিয়া পাল্কী নির্ব্বাক দুইটী প্রাণীকে বহন করিয়া ষ্টেশনের পথে ছুটিল।

৬

তাহার পরেও দুই দিন চলিয়া গেল, পবিত্রকে কোথাও পাওয়া গেল না। উমা ঠাকুর ঘরে পড়িয়া অসহায়ে অনিদ্রায় কাঁদিতেছেন, ভবশঙ্করের মুখখানা অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যদিও তিনি ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নাই, তথাপি তাঁহার মুখ দেখিলেই তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা সহজেই ধরা যাইতেছে।

দুই দিন পরে তিনি বাহিরে আসিলেন, সম্মুখেই পড়িয়া গেলেন দেওয়ান বনমালী রায়। ভবশঙ্করের কালিমামাখা মুখের পানে চাহিয়া তিনি আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতে-ছিলেন, কণ্ঠ সংযত করিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন, "দেওয়ান, পবিত্রের কোনও খবর জান কি ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বনমালী বলিলেন "না।"

"না ?" ভবশঙ্কর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন; একটু পরে বলিলেন "কেউ তার কথা বলতে পারলে না, কেউ তাকে দেখেনি ?"

তাঁহার কণ্ঠে যে কি আকুলতা বাজিয়া উঠিল, তাহা বনমালী বুঝিলেন। পিতার বেদনাতুর হৃদয় এইখানেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। কঠোরতার আবরণে এ কি

গোপনে রাখা যায়, এ কি লুকাইয়া থাকিবার জিনিস ? আঘাত পাইলেই এ যে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

মাথা নাড়িয়া বনমালী বলিলেন "কেউ না বাবু, কেউ তার কথা বলতে পারলে না, কেউ তাকে দেখেনি।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিয়া উঠিলেন "তবে সে কোথায় গেল ?"

দুই হাতে দেওয়ানের দুইটী হাত ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিলেন "পবিত্র শুধু আমারই নয় বনমালী, সে তোমারও ছেলে, বরং আমার চেয়ে সে তোমাকেই বেশী চেনে, বেশী ভালবাসে। বনমালী, এ সংসারে আমার পবিত্র ছাড়া আর কেউ নেই, আমার জীবনসর্ব্বস্ব ওই ছেলেটী। পবিত্র তোমারও তো তাই বনমালী, তোমারও এ জীবনে পবিত্র ছাড়া আর আছে কে ? তুমি কি কাজে যাচ্ছ, জমীদারির কাজে ? ফেলে দাও কাগজপত্র, ফেলে দাও সব। পবিত্রকে যেখান হতে পার নিয়ে এসো। আমার বাড়ী একেবারে শূন্য হয়ে গেছে, আমার বুক একেবারে খালি হয়ে গেছে। আমার সর্ব্বস্ব যাক বনমালী, আমার পবিত্রকে শুধু তুমি এনে দাও, তার মুখখানা একবার আমায় দেখাও।"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেওয়ানের হাত

ছাড়িয়া দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সম্মুখের গৃহে ঢুকিয়া পড়িলেন।

বনমালী আগেই পবিত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন ; সে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহার এক বন্ধুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। পিতৃস্নেহ কতদূর, এই স্নেহ-সমুদ্রের মধ্যে রসি ফেলিয়া তিনি তাহাই দেখিতেছিলেন। এইবার নিশ্চিন্ত মনে পবিত্রকে আনিতে তিনি যাত্রা করিলেন। মনটা অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিযুক্ত, যেহেতু পবিত্রকে পিতার রোষাগ্নিতে আর পড়িতে হইবে না।

ভবশঙ্কর নিদারুণ মর্ম্মযন্ত্রণায় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিলেন, যত ক্রোধ সব গিয়া পড়িতেছিল পূরবীর উপর। ভগবান না করুন, যদি পবিত্রের কিছু হইয়া থাকে, তিনি পূরবীর বক্ষে স্বহস্তে অস্ত্রাঘাত করিবেন। হোক নারী-হত্যা, সে নারীকে অনায়াসে হত্যা করিতে পারা যায়, যে পিতার স্নেহময় বক্ষ হইতে পুত্রকে ছিনাইয়া লয়। এ রাক্ষসীকে হত্যা করায় পাপ অর্শে না।

বৈকালে বনমালী ফিরিলেন, ভবশঙ্করকে সংবাদ দিলেন পবিত্র আসিয়াছে, সে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, সাহস করিয়া পিতার সম্মুখে আসিতে পারিতেছে না।

ভবশঙ্কর একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, মুখ হইতে অন্ধকারের রেখাটা সরিয়া গেল।

চোরের মত পবিত্র আসিয়া দরজার ভিতরে দাঁড়াইল।

ভবশঙ্কর অতৃপ্ত চোখে পুত্র মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথা গিয়েছিলে পবিত্র ?"

পবিত্র কথা কহিতে পারিল না, ভয়ে লজ্জায় ঘৃণায় সে মুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিতে পারিল না।

তাহাকে সম্মুখে বসিতে আদেশ দিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে পিতা বলিলেন, "তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছো কেন পবিত্র ? ছেলেমানুষি বুদ্ধির বশে একটা কাজ করে ফেলেছিলে, আমাকে কিছু না জানিয়ে। তখনও আমি যেমন তোমায় ক্ষমা করেছিলুম, এখনও তেমনি তোমায় ক্ষমা করছি। সমাজে আমার উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই আবার যা তাই হব, সমাজে আবার আমি প্রভুত্ব করতে পারব। আমি সমাজের কর্ত্তা, আমায় সমাজচ্যুত করবে, এত বড় ক্ষমতা কার আছে ? সেদিনকার অপমান যার জন্যে, তাকে সেই দিনই দূর করে দিয়েছি। খেয়ালের বশে একটা কাজ করেছিলে, তার জন্যে তোমার ওপরে আমি গুরুদণ্ড অর্পণ করব না।"

পবিত্র স্তব্ধভাবে বসিয়াই রহিল, সে মুখখানাও তুলিতে পারিল না।

ভবশঙ্কর তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা সেই পতিত কন্যার আর তার দাদামশায়ের,—জেনে শুনে ভদ্রলোকের জাত মারতে আসে, এতটা সাহস কারও হতে পারে না। তোমায় ছেলে মানুষ পেয়ে চোখে ধূলো দিতে পেরেছিল, আমারও দিতে পারত যদি না সমাজ জানতে পারত। উঃ, দামোদর রক্ষা করেছেন। আমার পুত্রবধূ সে, দামোদরের পূজার যোগাড়ও হয়তো তাকে করতে হত, কোনও দিন না কোন দিন ভোগ দেবারও ক্ষমতা তার হতো। কি হতো তবে—উঃ!"

আতঙ্কে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, ললাটে হাত দুখানা ঠেকাইয়া বলিলেন, "তিনিই প্রকাশ করে দিলেন। মঙ্গলময় তিনি ভক্তের মঙ্গলই বাঞ্ছা করেন। আমার দামোদর বড় জাগ্রত, তিনি তো ঘুমন্ত দেবতা নন যে, যে যা করবে সব সয়ে যাবেন। মানুষের সঙ্গে জুয়াচুরি চলতে পারে,—দেবতার সঙ্গে যদি চলত, তা হলে এ পৃথিবীতে পাপ পুণ্যের পার্থক্য কিছুই থাকত না।"

বনমালী রায় নীরবে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া কর্ত্তা বাবুর দীর্ঘ লেকচার শুনিয়া যাইতেছিলেন। হতভাগিনী পূরবীকে তিনিই সে রাত্রে টিকিট কিনিয়া ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। পূরবীর সেই শান্ত অথচ শোকপূর্ণ

মুখখানার কথা তাঁহার মনে দেদীপ্যমান। সর্ব্বস্ব দান করিয়া তেমনিই শান্তভাবে অকম্পিত পদক্ষেপ চলিয়া যাইতে পারে শুধু নারী, পুরুষ পারে না। তাহার চোখে তখন এক ফোঁটা জল ছিল না, মুখখানার উপরে তখন তাহার কি গম্ভীর ভাব ফুটিয়াছিল।

ট্রেণে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বৃদ্ধ বনমালী রায় কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। হায় হতভাগিনী, মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে আনন্দ উজ্জ্বল বক্ষে এই দেশের মাটীতেই পদার্পণ করিয়াছিলে না। তখন কত আশা ছিল তোমার বুকে, সুখের ভবিষ্যৎ চিত্র তুমি কতই না আঁকিয়াছিলে! আজ সব বিসর্জ্জন দিয়া, অন্ধকার হৃদয় বাহির ভরিয়া লইয়া যাইতেছ কোথায়?

সে উদ্বেগ ব্যাকুল নেত্রে দূর গ্রামের পানে চাহিতে-ছিল, কিন্তু মাঝে যে সূচিভেদ্য বিরাট বিপুল অন্ধকাররাশি, দৃষ্টি তাহার এ অন্ধকার ভেদ করিতে পারে কি?

ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া বৃদ্ধ বনমালী ঘুমাইতে পারেন নাই। শ্বশুরালয় হইতে চির-নির্ব্বাসিতা অভাগিনী পূরবীর মুখখানা কেবল তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার ব্যথা অনুভব করিয়া আর্ত্তস্বরে তিনি ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন।

আজ ভবশঙ্করের দীর্ঘ লেকচার শুনিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ধীর কণ্ঠে বলিলেন "আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন আপনি, একটা কথা বলবার আদেশ আমি চাচ্ছি। ভগবান জাগ্রত, কিন্তু একজনের মঙ্গল করে আর একজনের অমঙ্গল করেছেন, এতে তাঁকে দয়াময় বলা যায় না।"

ভবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন "কার অমঙ্গল?"

বনমালী উত্তর দিলেন "যে মেয়েটা এসেছিল।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভবশঙ্কর মুখ ফিরাইলেন।

সাহস করিয়া বনমালী বলিলেন, "রাগ করবেন না বাবু, আমি যা বলছি, এটা রাগের কথা নয়। আপনার এতে মঙ্গল হল, আপনার দেবতা তার স্পর্শ হতে নিষ্কৃতি পেলেন, কিন্তু একটা সত্য কথা বলছি বাবু, দেবতা কি শুধু ওই একটা আধারেই ন্যস্ত আছেন. না, সর্ব্বজীবে, চরাচরের মধ্যে বিদ্যমান আছেন? সে পতিতার মেয়ে, এই তার অপরাধ, কিন্তু সত্যের দিক হতে চেয়ে বলুন, সেই পতিতার মধ্যেও কি নারায়ণ ছিলেন না? নারায়ণ জাগ্রত, সে তো ঠিক কথা, কারণ জীবজগৎ যখন বিদ্যমান রয়েছে, তার মধ্যে নারায়ণও রয়েছেন। জীবজগতের অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করা যেত,

নারায়ণের অস্তিত্বও আমরা অস্বীকার করতে পারতুম। আপনি জ্ঞানী, কিন্তু সব বুঝেও এই বিষম ভুলটা করে ফেলেছেন যে বাবু, একটা পাথরের মধ্যেই আপনার দেবতাকে দেখছেন, সর্ব্বভূতে দেখতে পান নি। আর সে অভাগিনী, ধরে নিচ্ছি পতিতার মেয়ে সে, কিন্তু সে কি পাপে পতিতা হয়েছে? সে নিজে পবিত্রা, নিষ্ঠাচারিণী, তার শুচিতাই কি তাকে তুলে দেবে না, পতিতা মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকেই যে করতে হবে, এমন কোনও কথা আছে কি?"

ধীর স্বরে ভবশঙ্কর বলিলেন; "যদি এই হিসাবেই কথাটা বলে থাকো বনমালী, তবে এই কথার শেষ আমায় এই-খানেই করতে দাও। সমাজ গঠন হয়েছে ধর্ম্মের জন্য, সমাজকে হেলা আমরা কখনই করতে পারব না। সমাজের অনুবর্ত্তী হয়ে শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে, এই হচ্ছে সমাজের উদ্দেশ্য। সত্যকে চিনতে পেরেছি, কিন্তু তা বলে সমাজের বিরুদ্ধে চলতে পারব না। আমাদের মধ্যে এমন ঢের লোকই তো আছে যারা বলে, বিশ্বাস করে, সর্ব্বজীবে ঈশ্বর বিরাজিত, তবু কেন তারা ভিন্ন ভাবে চলে, শুচিতাকে কেন বাঁচিয়ে যায়? মেয়েদের কথা আমি ধরিনে, কারণ অল্পেতেই তারা খুব বেশী করে

ধরে নেয়—আমি পুরুষদের কথা বলছি। যাঁরা মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত, যাঁদের হৃদয় জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত, তাঁরাই বা কেন এতদূর স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বেছে চলেন? অনেক হিন্দুর রান্না ঘরের চালে মুরগী বসলে কেন তাঁরা ঘরের ভিতরকার জিনিস পত্র ফেলে দেন? কুয়া ইঁদারা—এ সব অন্য জাতি দ্বারা কেন তাঁরা স্পৃষ্ট হতে দেন না? এই বিচারটাকে তাঁরা সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন,—এই বিচারের বশেই পতিতার মেয়ে কিছুতেই সমাজে প্রবেশলাভ করতে পারবে না, সমাজের দ্বার তার কাছে চিররুদ্ধ। পতিতার ছেলে অথবা মেয়ে তাদের পতিতা মায়ের পাপের ফল ভোগ করবেই, সমাজ তার শুদ্ধাচারিতা জানলেও তাকে গ্রহণ করবে না। অস্বীকার করছি নে, জ্ঞানীর হৃদয়ে যে ভগবান আছেন অজ্ঞানীর হৃদয়েও তিনি আছেন, পুণ্যাত্মার মধ্যেও যিনি, পাপাত্মার মধ্যেও তিনি। সবাই যদি সেটা বুঝে চলত, পাপীকে ক্ষমা করত, বিধর্ম্মীকে সমান অধিকার দান করত, আমিও করতে পারতুম। সমাজে বাস করতে গেলে, সমাজের অনুশাসন মেনেই আমায় চলতে হবে, সে রকম স্থলে সত্যকেও গোপন করে রাখতে হবে।”

বনমালী ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। পিতার সম্মুখ হইতে পবিত্রও উঠিয়া গিয়া বাঁচিল।

উমার সহিত তাহার দেখা হইল, উমা নিঃশব্দে তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অভাগিনী পূরবীর মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাসের কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। পূরবীর এ সর্ব্বনাশ তাঁহার পবিত্রের দ্বারাই হইয়াছে, তাই তিনি নীরব, অন্য কেহ হইলে তিনি বোধ হয় রাগিয়া উঠিতেন।

পবিত্রের অবিন্যস্ত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কাজটা মোটেই ভাল হয় নি পবিত্র। আহা, সরলা বালিকা সে, কিছু জানে না, তার ওপরে এই গুরুদণ্ডটা দেওয়া উচিত হয় নি। আচ্ছা পবিত্র, একটা কথা তোকে আমি জিজ্ঞাসা করি, বিয়ের আগ্রহটা তোর বেশী ছিল, না, তাদের বেশী ছিল ?"

"আমার মাসীমা—" পবিত্র মাসীমার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখিল, মুখ তুলিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল।

"তোর ছিল ? তুই যখন তাদের বলেছিলি, তারা তখনি রাজি হয়েছিল কি ?"

পবিত্র মুখ তুলিল, বলিল, "না মাসীমা, তারা প্রথমে

কিছুতেই রাজি হয় নি। শেষে আমার জেদে পড়েই বুড়ো বিয়ে দিতে রাজি হল।”

মাসীমা অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া বলিলেন, “আচ্ছা যা এখন।”

নীরব শয়ন গৃহে পবিত্র একা।

তাহার মনে হইতেছিল, সেই দিন দুপুরে পলায়নের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একবার পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মতন সে এই গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; তখন পূরবী ধূলায় মূর্চ্ছিত-প্রায় পড়িয়া। চোখেরজলে ওইখানটায় ঢেউ খেলিয়া যাইতে-ছিল, এখনও যেন সে জলের দাগ সেখানে রহিয়াছে।

কি অসহ্য মর্ম্মবেদনাতেই সে কাঁদিতেছিল। বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু সে লাভ করিয়াছিল, ভগবানের চোখের একটী ভ্রূকুটীতে সে সব হারাইয়া ফেলিয়া, অবশেষে ভিখারিণীর চেয়েও অধমা হইয়া সে দেশত্যাগ করিল।

পবিত্র দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

৭

পূরবী ফিরিয়া আসিয়াছে।

পূরবী ফিরিয়াছে, কিন্তু যে পূরবী গিয়াছিল, এ সে পূরবী নয়। সে পূরবী হাসিতে হাসিতে সম্মুখে পূর্ণ

আশার আলোক দেখিয়া ত্রস্তপদে গিয়াছিল, এ পূরবী হৃদয়ে দারুণ অন্ধকার লইয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া, চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ফিরিয়াছে; তাই বলিতেছি, এ সে পূরবী নয়, এ পূরবীর ছায়া মাত্র।

আর কথায় কথায় তাহার হাসি তেমনভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না, দাদামহাশয়ের সহিত সে কৌতুক আর নাই। এখন জোর করিয়া যদিও সে হাসিতে যায়, সে চেষ্টাতে হাসি আসে না, আসিয়া পড়ে চোখে অশ্রু; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সে পলাইয়া যায়। কাজ কর্ম্ম নেহাৎ না করিলে নয়, তাও যদি নিজের জন্য হইত, সে কিছুই করিত না, কিন্তু দাদামশাই যে আছেন তাঁহাকে যে খাওয়াইতেই হইবে; তাই সে আবার তেমনিই—আগের মত প্রভাতে উঠিয়াই সংসারের কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু তাই বা কত? সামান্য রন্ধন পরিবেশন, বাসন মাজা, জল তোলা; অবকাশ যে গোটা দিন। সমস্ত দিনটা তবুও সে ভাবিবার সময় পাইত না, কিন্তু রাত্রি তো আছে।

আনন্দপূর্ণ গৃহ একেবারে নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে, বীণা বাজিতে বাজিতে থামিয়া গিয়াছে; তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাই এ বীণা আর বাজিয়া উঠে না। বৃদ্ধ দাদামশাই কেশশূন্য মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবেন,

এ আবার কি হইল ? আবার কি করিলে সেই আনন্দপূর্ণ দিন ফিরিয়া আসিবে ?

নাতনীর বিষাদ-মলিন মুখখানার পানে চান, আর তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া হাহাকারের সুর বাজিয়া উঠে। এক এক দিন তিনি তাহাকে ধরিয়া বই পড়িতে বসান, নিজে স্তব্ধভাবে শুনিতে বসেন। শুনিতে শুনিতে মনটা কোথায় চলিয়া যায়, বইয়ের দিকে আর মন থাকে না। তাহার পর পড়িতে পড়িতে পূরবী হঠাৎ থামিয়া যায় ; দাদামশাইয়ের পানে চাহিয়া দেখে তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। তখন জিজ্ঞাসা করে, "শুনছো দাদামশাই ?"

দাদামশাই হঠাৎ চমকাইয়া উঠেন, সে চমকানিটা তাঁহার নিজের কাছেই অনুভূত হয়, তিনি লজ্জিত হইয়া উঠিয়া বলেন "শুনছি বই কি দিদি, বেশ শুনছি। আর একবার ওই জায়গাটা পড় দেখি, কি পড়লি মনে হচ্ছে না।"

দাদামহাশয়ের অবস্থাটা মনে করিয়া গভীর বেদনায় পূরবীর হৃদয় ভরিয়া উঠে, বই বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে "আজ থাক দাদা, কাল তোমায় আবার শুনাব।"

কিন্তু এমন করিয়া তো দিন কাটে না। এ কি ভীষণ গোপন ব্যথা জাগিয়া দুইটী হৃদয়ের মধ্যে ? হাসিতে গেলে

হৃদয়ের ক্ষততে আঘাত লাগিয়া কেন টন টন করিয়া উঠে ? এ ক্ষতকে শুষ্ক করিতে হইবে যে, ঔষধ দিতে হইবে যে ; দিন দিন বাড়িতে দিলে তো চলিবে না।

সে দিন দুপুরে পূরবী আহারান্তে ছাদ হইতে শুষ্ক কাপড় তুলিয়া আনিতে গিয়াছিল। নিচে দাদামশাইয়ের ব্যগ্র আহ্বান শুনিল "পূরবী—শিগগীর আয় দিদি, একটা মজা দেখে যা।"

পূর্ব্বেকার একটি কথা পূরবীর মনে জাগিয়া উঠিল, সেদিনও দাদামশাই এমনি ব্যগ্র কণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়াছিলেন, ছুটিতে ছুটিতে নিচে গিয়া সে পবিত্রকে দেখিতে পাইয়াছিল।

কাপড় তোলা ফেলিয়া পূরবী তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গেল।

"এই দেখ দিদি, তোর জন্যে কি এনেছি।"

শুভ্র লোম বিশিষ্ট ক্ষুদ্র একটা কাবুলী বিড়ালের ছানা। চোখ দুইটা তার সুলোহিত, লোমগুলি খুব বড় বড়। তাহার গলায় আবার রেশমী ফিতায় গাঁথা গুটিকত ঘুঙুর।

বিশুষ্ক মুখে একবার চাহিয়া পূরবী ফিরিবার উদ্যোগ করিল। ব্যগ্র দাদামহাশয় বলিলেন "যাচ্ছিস যে ?"

পূরবী বলিল "কি করব দাদা, ছাদে কাপড়গুলো সব পড়ে আছে, সেগুলো তুলে আনি গিয়ে। এই বৈশাখের বাতাস, উড়ে পথে গিয়ে পড়বে এখন।"

জলধর বলিলেন "এক আধ মিনিটেই উড়ে গিয়ে পড়ছে না। কেমন বিড়ালের ছানাটা বল দেখি।"

সংক্ষেপে পূরবী উত্তর দিল "বেশ।"

উৎসাহিত বৃদ্ধ বলিলেন, "তা একবার জিজ্ঞাসা কর কোথায় পেলুম। নবেনবাবুর বিড়ালের একটীমাত্র ছানা এ, তারা কি কিছুতে দিতে চায়? নেহাৎ আমি না কি নাছোড়বান্দা, তাই কত করে নিয়ে এলুম। তারা বলেছে, তিন দিন অন্তর একবার করে ছানাটাকে তাদের দেখিয়ে আসতে হবে, আর খুব বেশী করে মাছ দুধ খাওয়াতে হবে। তা হলে তো দিদি, মাছ দুধ একটু বেশী করে নিতে হবে, নইলে তো চলবে না।"

"আচ্ছা দেখা যাবে" বলিয়া পূরবী আবার ফিরিতেছিল, বিড়াল ছানাটীর সম্বন্ধে তাহাকে এতটা উদাসীনা দেখিয়া বৃদ্ধ হতভম্ব হইয়া গিয়া বলিলেন "আবার যাচ্ছিস যে?"

"ছাদে কাপড়গুলো—"

রাগত সুরে দাদামহাশয় বলিলেন "দূর হোক গিয়ে কাপড়, এটাকে তুই নিবি না আমি কোলে করে বসে থাকব?"

বিড়াল ছানাটীর সম্বন্ধে গোপন কথা পূরবীর মনে এবার স্ফুট হইয়া জাগিয়া উঠিল। বৃদ্ধ দাদামহাশয় কোন কিছুর মধ্যেই তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিলেন না। নরেনবাবুর বাড়ীতে অজস্র অপমান স্বীকার করিয়াও তিনি শুধু তাহাকে একটু অন্যমনস্কা করিবার জন্য বিড়াল ছানাটী আনিয়াছেন। স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের কথা ভাবিয়া পূরবী তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, চোখের পাতা বার বার ফেলিয়া জলটুকু শুষিয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল "বিড়ালছানা আমার কি করবে দাদা? আমি এই বিড়ালছানা নিয়ে কি করব? না, এ তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো—যদি আমার জন্যেই একে তুমি এনে থাক। আমি তো ছেলেমানুষ নই যে বিড়ালছানা নিয়ে খেলা করব।"

"তুই ছেলেমানুষ নোস? মাত্র পনের বছর বয়েসেই এ অভিজ্ঞতাটা কোথায় লাভ করলি দিদি—?"

তাহার হাতখানা টানিয়া তাহাকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "তোকে এই বয়সেই এত ভাবতে কে শেখালে পূরবী? তুই তো এক দিনও ভাবতিস নে, এক দিনও তো তোর চোখে জল দেখি নি, আমার সঙ্গে হেসে খেলেই যে তোর

দিন যাচ্ছিল। এই বিড়ালের ছানা নিবি বলেছিলি, বলেছিলি কাবুলী বিড়ালের ছানা যদি পাস, আর কিছু তুই চাস নে, আজ সে কথা তোকে কে ভুলিয়ে দিলে দিদি? মাত্র পনর বছর বয়েসেই সকল সুখ সাধ বিসর্জ্জন দিলি কার জন্যে দিদি?"

'ও কি করছ দাদা—ও কি, ছিঃ, কাঁদছো কেন?'

পূরবী তাড়াতাড়ি নিজের অঞ্চল দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিল "পাগল হয়েছ না কি? বা রে, কোথাও কিছু না—কেঁদে বাড়ী মাথায় করছো। ওরকম করে কাঁদতে আছে কি? দিন দিন যেন তুমি ছেলে মানুষের অধম হচ্ছো দাদা। চুপ কর বলছি—চুপ না করলে সত্যি আমি এমন রাগ করব যে—কিছু খাব না।"

দাদামহাশয় চুপ করিয়া গেলেন, খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। পূরবীও চুপ করিয়া দাদামহাশয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

"একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দাদামহাশয় বলিলেন "তবে বিড়াল ছানাটাকে দিয়ে আসি?"

পূরবী শান্ত কণ্ঠে বলিল "না, দেবে কেন? এনেছ যখন, থাক। ওর জন্যে মাছ দুধের বন্দোবস্ত করে দেওয়া যাবে। ও বেশ খেলে বেড়াচ্ছে বেড়াক। তুমি ভাল

হয়ে বস দাদু, তোমাব মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে তার পর কাপড়গুলো তুলে আনব এখন। ইস্, তোমার মাথার চুল যে একেবারে সব পেকে গেছে দাদামশাই, সত্যি তোমার চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে।"

দাদামহাশয় হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিলেন "আজই বুঝি তোর চোখে পড়ল পূরবী? ওরে, ও আজকের পাকা চুল নয়, চুল পাকতে সুরু হয়েছে সেই দিন যেদিন তারা আমায় একলা ফেলে চলে গেল। তার পরে তোকে পেয়ে আমার পাকা চুল আবার কাঁচিয়েছিল রে, আমার যৌবন আবার ফিরে আসছিল, হঠাৎ সেদিন স্বপ্ন টুটে গিয়ে দেখলুম, মিথ্যে স্বপ্নে ভুলে ছিলুম, আমায় ডিঙিয়ে কোন দিন ত্রিশটা বছর চলে গেছে। আমি জোর করে দাঁড়াতে গেলুম, সেদিন সমাজের সামনে, কিন্তু ষাট বছরেব বার্দ্ধক্য হঠাৎ আমায় আক্রমণ করে আমার হাঁটু কাঁপিয়ে ফেলে দিলে, ষাট বছরের মাথা থর থর করে কেঁপে আর উঁচু হল না, ষাট বছরের দৃষ্টি-হীনতা ঘুরে এল। ওরে দিদি, বুকে ঢের আঘাত সয়েছি, কিন্তু এ আঘাত কিছুতেই সইতে পারলুম না। উঃ, আমার বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দে দিদি; দেখ একবার, বুকের মধ্যে আমার কি রকম করছে।"

পূরবী তাড়াতাড়ি তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। পাণ্ডুর মুখে দাদামশাই বলিলেন, "কি জানি, হঠাৎ কেন বুকটায় এই রকম ব্যথা ধরা আরম্ভ হয়েছে। মাথা ঘুরে ওঠে, চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, মনে হয় প্রাণটা এখনই বেরিয়ে যাবে।"

উদ্বিগ্ন হইয়া পূরবী বলিল "একটা ডাক্তার ডাকব কি দাদা? এ রকম করে অসুখ পুষে রাখা—"

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া দাদামহাশয় বলিলেন "দূর, পাগল হয়েছিস দিদি? ওই সেরে গেল, ওর জন্যে ভাবনা? ভয় নেই তোর, ভয় নেই রে, আমি এখনি মরব না, আমি মরলে তুই দাঁড়াবি কোথায়, কে তোকে দেখবে? ভগবান এখন আমায় কক্ষনো নেবেন না। যা তুই, কাপড় তুলে আন গিয়ে, আমি ততক্ষণ একটু শুয়ে থাকি চুপ করে।"

এক কথাতেই বুকের ব্যথাটা সারিয়া গেল, কিন্তু পূরবী আশ্বস্ত হইল না; তেমনি ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল "তা আনছি দাদু, পরে আনলেই চলবে এখন। তোমার বুকটায় ততক্ষণ হাত বুলিয়ে দিই দাদামশাই, তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাও দেখি। এই ঠিক দুপুরবেলা, তাই বুকের মধ্যে তোমার আনচান করছে।"

ছোট শিশুর মত দাদামহাশয়কে শোয়াইয়া সে তাঁহার বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

৮

এম-এ পাসের খবর বাহির হইলে দেখা গেল, পবিত্র সম্মানের সহিত পাস করিয়াছে।

বাড়ীতে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভবশঙ্কর গ্রামা দেবী চণ্ডীর নিকট ষোড়শোপচারে পূজা পাঠাইয়া দিলেন, বাড়ীতে দামোদরের ষোড়শোপচারে পূজা হইল, সোণার সিংহাসনে ঠাকুরকে বসাইয়া মুক্তার ঝালর দেওয়া পাখা দ্বারা বাতাস করা হইল। অনেক দরিদ্র জমীদার বাটী হইতে খাদ্য ও বস্ত্র লাভ করিল, গ্রাম সুদ্ধ লোক এই উপলক্ষে জমীদার বাটীতে আহার করিয়া গেল। আসিলেন না কেবল রামময়বাবু। বরাবর তিনি কখনই আসিতেন না, বউভাতের দিন ভবশঙ্করকে অপদস্থ করিবার ইচ্ছাতেই তিনি আসিয়াছিলেন। আজ তিনি না আসিলেও কোনও ক্ষতি হয় নাই, যেহেতু কেহই সেদিকে অত দৃষ্টি দেয় নাই।

এই আনন্দ উচ্ছ্বাস তিনজনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। একজন বনমালী। দুঃখিনী পূরবীর বিদায়কালীন

মুখখানা তাঁহার মনে জাগিতেছিল ; সে শোকদগ্ধ মনে করিয়া আজিকার এ আনন্দোচ্ছ্বাস মোটেই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না ; কিন্তু এ না করিলেও তো নয়, বেতন-ভোগী ভৃত্য যে তিনি। যদি তিনি বেতনভোগী ভৃত্য না হইতেন, তাহা হইলে আজ কখনই তিনি এ আনন্দোচ্ছ্বাসে যোগ দিতেন না।

আর আজিকার এ আনন্দোচ্ছ্বাস হৃদয় শোকাকুল করিতেছিল পবিত্রের।

পবিত্রের মুখ মলিন, চকিতে এক আধবার লোক দেখানো হাসির রেখা যদিও তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা জোর করিয়া টানিয়া আনা মাত্র।

হায়, যদি আজ সে থাকিত—তবেই না সে যথার্থ আনন্দ পাইত ? হৃদয়ে যাহার আগুন জ্বলিতেছে, বাহিরে প্রচুর জল গায়ে ঢালিয়া তাহার কি শান্তি ? এ সাফল্যে সে একটুও আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই ; তাহার মনে হইতেছিল, যে মরিতে বসিয়াছে তাহাকে আর সাজাইয়া লাভ কি ? শ্মশানে বাসর-শয্যা কেন ? যে হৃদয়ের শান্তি, আনন্দ চিরতরে হারাইয়াছে, তাহাকে শান্তি আনন্দ দিবার জন্য কেন ঐ মিথ্যা প্রয়াস ?

পবিত্রের মলিন মুখখানা হঠাৎ কার্য্যনিরতা উমার

চোখে একবার পড়িয়া গেল ; তাঁহার মনেও না কি শান্তি ছিল না ; তাই পবিত্রের মুখখানা দেখিবামাত্র তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। নির্জ্জনে তাহাকে ডাকিয়া বসাইয়া বলিলেন "সবাই আনন্দ করছে বাবা, তোর আনন্দ নেই কেন বল দেখি ?"

হাসি টানিয়া আনিয়া পবিত্র বলিল "আনন্দ নেই, সে কি কথা মাসীমা ? এমন দিন, এদিনে আমার আনন্দ থাকবে না ? আমারই পাশের খবর, আমারই জন্যে এত আয়োজন, খাওয়ানো, পূজা দেওয়া,—আমার আনন্দ হবে না তো কার হবে মাসীমা ?"

শেষের দিকে তাহার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যথা বাজিয়া উঠিয়াছিল, সুরটা কেমন যেন বদলাইয়া গেল, সে নিজে তাহা লক্ষ্য করিল না, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী উমা তাহা লক্ষ্য করিলেন।

পবিত্রের মাথায় হাত দিয়া করুণ সুরে তিনি বলিলেন, আমায় ভুল বোঝাতে চেষ্টা করিস্‌নে পবিত্র, তোকে আমি যতটা চিনি, এতটা আর কেউ চেনে না। তোর ঐ টেনে আনা হাসি দিয়ে তোর বাবাকে তুই ভোলাতে পারিস, কিন্তু আমাকে তুই ভোলাতে পারবিনে বাবা। আমি সব বুঝতে পারছি, সব জানতে পারছি, কিন্তু জেনে কি করব বল ?

তোর মাসীকেও ওদলে ফেলিস্‌নে পবিত্র, তোর মাসীমা পুরুষ নয়, নারী ; তার বুক পাষাণ দিয়ে গড়া নয় রে ;— তার বুকে মা জেগে আছে।”

তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পবিত্রের ললাটের উপর পড়িয়া গেল। সমান ব্যথার ব্যথী এক জনকে পাইয়া আজ পবিত্রের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, মাসীমার স্নেহময় কোলে ছোটবেলার মতই মুখখানা লুকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল “মাসীমা—”

চট করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া উমা বলিলেন “তুই তো প্রায়ই কলকাতায় যাওয়া আসা করিস পবিত্র—”

মুখ তুলিয়া পবিত্র বলিল “তাতে কি মাসীমা ?

মাসিমার মনের কথা স্পষ্ট সে জানিতে পারিল।

চাপা সুরে মাসীমা বলিলেন “একবার সেখানে যাস বাবা। আহা! বড় ব্যথা বুকে নিয়ে তারা দুজন বিদায় নিয়েছেরে, তাদের সে ব্যথা অনুভব করার শক্তি কারও নেই। সমাজ অবহেলে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে গেল, সে বাজ যারা বুক পেতে নিলে, তাদের পানে একবার ফিরেও চাইলে না। সমাজ নিষ্ঠুর; তোর বাপ তার বেশী নিষ্ঠুর, তা বলে তুইও কি নিষ্ঠুর হবি পবিত্র ? তোর নিষ্ঠুর হলে চলবে না তো বাপ, সে যে তোর বিবাহিতা

স্ত্রী। যে ধর্ম্ম-ত্যাগের ভয়ে তোর বাপ তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে, সেই ধর্ম্মকেই সাক্ষী রেখে যে তাকে তুই গ্রহণ করেছিস্, অমন করে তাড়িয়ে দেওয়া তোর তো মানাবে না। তার কলঙ্ক তোকেই যে ঢাকতে হবে রে, তাকে আড়াল করে তোকেই যে সবার সামনে বের হতে হবে। স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা তো উড়িয়ে দেবার নয়, হিন্দ্ শাস্ত্র স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে কি বলেছে সেটা জানিস কি? না বাবা, তোকে যেতে হবে, তোকে তাদের বুঝাতে হবে! যদিও সে এখানে আসবার অধিকার না পায় তবু—ও"

"মাপ কর মাসীমা, আমি যেতে পারব না।"

বিস্মিতা মাসিমা বলিলেন, "কেন, তোর লজ্জা হবে? তাতে লজ্জা কি বাবা, এতে তোর দোষ কি? সত্যিই তুই জানতিস্ নে কার মেয়ে, না জেনে বিয়ে করেছিস। তার পর তোর বাবা- সমাজ জানতে পেরে, যে দণ্ড অর্পণ করেছে, তাতে তোর কি অপরাধ পবিত্র? আমি বলছি, এতে কোনও লজ্জা নেই তোর, তুই যা একবার। আহা, তাদের মুখখানা একবার মনে কর্‌রে। দেখ দেখি বুকে কি যন্ত্রণা সইছিস, তবু যেতে পারবি নে?"

দৃঢ় অথচ শান্ত সুরে পবিত্র বলিল "না মাসীমা, তবুও

যেতে পারব না। আমি সমাজ মানিনে, ধর্ম্ম মানিনে, কেবল মানি বাবাকে। বাবার আদেশ আমি লঙ্ঘন করতে পারব না মাসীমা, বাবাকে আমি আর অপদস্থ করতে পারব না। মাসীমা সত্যি বাবাকে ততটা হৃদয়হীন ভেব না, বাবার যা জ্ঞান আছে, আর কারও তা নেই বলেই আমার ধারণা। সেই দিনটার কথা একবার মনে কর দেখি মাসীমা, সমাজের লোক আমাদের বাড়ী, তার মাঝখানে যখন প্রকাশ হল আমি পতিতার মেয়েকে বিয়ে করে এনেছি, তখন বাবার উঁচু মাথা কি রকম নুইয়ে পড়ল। মাসীমা, বাবা আমার সে দোষ ধরবেন না, ধরতে পারলেন না, সেই কুলকলঙ্ক ছেলে আমি, আমারই দুদিন অদর্শনে তিনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন। না মাসীমা, আমি আমার এমন বাপের আদেশ কখনই অমান্য করতে পারব না, আমি সেখানে কিছুতেই যেতে পারব না, আমি এমনি ভাবেই থাকব। তাদের অদৃষ্টে কষ্ট ছিল, সে কষ্ট ভোগ করেছে, আজীবন কাল করবেও ; আমার অদৃষ্টে কষ্ট ছিল, ভোগ করেছি, ভোগ করবার জন্যে প্রস্তুতও আছি। আমার সমাজ যাক, ধর্ম্ম যাক, বিবাহিত স্ত্রী যাক, আমায় বাবার যোগ্য ছেলে হবার আশীর্ব্বাদ শুধু কর।"

"পবিত্র—"

উমার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, পবিত্রের মাথাটী বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

"তাই যদি হয়, তবে তাই আশীর্ব্বাদ করছি বাবা, ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করছি তাই।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিলেন "কিন্তু আমি যে থাকতে পারছি নে পবিত্র, আমি বউমাকে লুকিয়ে একখানা পত্র দেব কি? তোর কর্ত্তব্য তুই পালন করে যা, আমার কর্ত্তব্য কি এই-ই নয়? আহা, তার জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

পবিত্র শুষ্ক মুখে বলিল "না মাসীমা, তোমারও পত্র দেওয়া উচিত নয়। বাবা যদি বলেন দিতে পার, কিন্তু বাবাকে না জানিয়ে পত্র দিলে বাবাকে অপমানিত করা হবে মাত্র।"

"তবে থাক—"

আর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উমা কার্য্যোদ্দেশে উঠিয়া গেলেন, পবিত্রও বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে তখন রীতিমত একটা সভা বসিয়া গিয়াছে। আজ ভবশঙ্করের মুখে হাসি ধরিতেছে না। সচরাচর তাঁহার মুখে হাসি বড় কমই দেখা যায়, আজ হৃদয়ের আনন্দ মুখে উছলাইয়া উঠিতেছে। টোলের পণ্ডিত

শিরোমণি মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া তখন তিনি বলিতেছিলেন, "বুঝেছেন, শিরোমণি মশাই, আজকার দিনে রামময়ের দেখা নেই। আর মাস কত আগে সেই দিনটার কথা মনে করুন দেখি একবার। বাস্তবিক আমি সেদিন মোটে ভাবিনি, রামময় আমার বাড়ী আসবে। আপনারা তো বরাবরই দেখে আসছেন, সে কখনও আমার বাড়ীর ছায়া মাড়ায় না, হঠাৎ সে সেদিন এসে হাজির। উদ্দেশ্য তার আমায় লাঞ্ছিত, অপমানিত করা কি না, তাই এসে সভায় সেদিন মহাভারত গেয়ে গেল। আজকার দিনে তার খোঁজ নেন দেখি? আজ যে গাঁ সুদ্ধ লোক এসে খেয়ে গেল, আমার পবিত্র এন এ পাশ করেছে, আজ কি সে এ দিক মুখো হবে?"

শিরোমণি মহাশয় একটিপ নস্য লইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন "আরে রামোঃ, তার কথা আর বলবেন না। অমন লোক যদি দুনিয়ায় আর একটা দেখা যায়। বুঝেছেন—নিজের ঘরে কত অনাচার ব্যভিচারিতা না চলে যাচ্ছে, তাতে কোনও দোষ নেই, দোষ হল আপনার বেলাতেই।"

মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া ভবশঙ্কর বলিলেন "কিন্তু এটা তো ভাবা উচিত, আমরা জেনে শুনে বিয়ে দিয়েছি

কি না? এতো মশাই জানা কথা, আমি ও বিয়ের কিছুই জানিনে। আমার একটামাত্র ছেলে, তার বিয়ে সে কি বড় সুখের কথা? বিয়ের কথা জানতে পারলে আমিই যে পঞ্চাশ খানা গাঁয়ের লোক তখনি এক করতুম। আমায় না বলে—ছেলে মানুষ, খেয়ালের বশে একটা কার্য করে ফেলেছ, তার জন্যে রামময়ের এতটা করা উচিত হয় নি। আমায় যদি আগে একটিবার চুপি চুপি জানাত—যদি অত শত্রুতারই দরকার ছিল তার, সেইটেই না সব চেয়ে ভাল কাজ হতো, দেশে দেশে এ কলঙ্কের বার্তা ভেসে যেত না। বুঝেছেন শিরোমণি মশাই, এ হচ্ছে কেবল শত্রুতা, শত্রুতা করবার জন্যেই সে নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বাছা আমায় সমাজচ্যুত করবেন! এমন কি ক্ষমতা আছে তার? আমি নিজে হচ্চি সমাজের মাথা। আমার ছেলে না জেনে না শুনে বেশ্যাকন্যাকে বিয়ে করে এনেছে বলে আমিও যে তাকে গ্রহণ করব, এমন কথা কিছুতেই হতে পারে না। এই যে জানতে পারবামাত্র সেটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম, আর একটা রাত পর্য্যন্ত আমার বাড়ীতে থাকতে দিলুম না। বলি ভয়টা বেশী তার না আমার? আমারই জাতিপাত হবে, ধর্ম্মপাত হবে, তার তো কিছুই হবে না।"

শিরোমণি ঘাড় কাত করিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন "ঠিক কথা বলেছেন ; সত্যি কথা বলেছেন। তা আর বলবেন না, আপনি কি যে সে লোক ? কথাতেই আছে— যে যেমন ভার সইতে সক্ষম, ভগবান তার ঘাড়ে তেমনি ভার দেন, তার সাক্ষী আপনিই। ভার সইবার মত ক্ষমতা আপনার আছে বলে আপনার ঘাড়ে এতবড় একটা জমিদারী, এত বড় একটা সমাজ। সমাজের উচ্চ আদর্শ আপনি। সেদিন পতিতার মেয়েকে ত্যাগ করে যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তাতে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। সবাই বলেছে, সমাজে এমন লোক আর হবে না। রামময় বাবু দেখছেন ভগবান আপনার অনুকূল, কেন না আপনাকে লাঞ্ছিত সমাজচ্যুত করবার জন্যই তিনি অত লোকের সামনে কথাটা পাড়লেন, কিন্তু ফল হল সম্পূর্ণ উল্টো, দেশে আপনার নামে জয় জয়কার পড়ে গেল। ব্যাপার গুরুতর দেখে তিনি এখন পেছিয়ে গেছেন, তাইতে বড় একটা লোকের সামনে বারও হন না।"

অতিরিক্ত প্রশংসাবাদে স্ফীত হইয়া ভবশঙ্কর তামাক টানিতে লাগিলেন। পবিত্র দূর হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

বুকের সে বেদনা তো সারে না। হয় তো দুচারদিন ভাল যায়, এক এক দিন বুকে কি রকম ব্যথা ধরে, বৃদ্ধ জলধর অসীম যন্ত্রণায় নীল হইয়া যান, তথাপি পাছে পূরবী ভয় পায় তাই মুখ ফুটিয়া কিছুই বলেন না।

কিন্তু তিনি না বলিলেও পূরবী তাহা বুঝিত। নিজের বেদনা সে ভুলিয়া গেল ইচ্ছা করিয়া, এক দিন তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া সে ডাক্তার ডাকিল।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিলেন, বিমর্ষ মুখে বলিলেন "হৃৎপিণ্ডের ব্যারাম হয়েছে, খুব সাবধানে রাখা দরকার। একটু বেশী রকম ধাক্কা খেলে হার্ট ফেলও করতে পারে।"

ব্যাকুল ভাবে দাদামহাশয়ের বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধ কণ্ঠে পূরবী ডাকিল "দাদু—"

তাহার মনে সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল, আর বুঝি সে দাদু বলিয়া ডাকিতে পাইবে না, তাহার এ ডাকও বুঝি চিরকালের মত ফুরাইয়া যায়। জগতে আসিয়া সে একটী মাত্র স্নেহপূর্ণ হৃদয় পাইয়াছে, সে হৃদয়ও বুঝি ছাড়া হয়। চির অভাগিনী সে, মা বলিয়া সে ডাকিতে পায় নাই, মা নাম মুখে আনিতে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া যায়, দাদামশাইকে ডাকিয়া সে একাধারে সব নামে ডাকারই সার্থকতা লাভ

করিত। তাহার অদৃষ্টবশে বুঝি তাহার দাদুও যান। অভাগিনী হঠাৎ উচ্ছ্বসিতা হইয়া কাঁদিয়া উঠিল. আবার ডাকিল "দাদামশাই।"

"আঃ পাগলী, চোখে জল ? কেন, বল দেখি ? ডাক্তার বলে গেছে আমার হার্টডিজিজ হয়েছে, কোন সময়ে হার্ট ফেল করবে, তাই বুঝি ? আরে - ও সব নির্ছাক মিথ্যে কথা, তা বুঝি বুঝতে পারছিস নে ? ডাক্তাররা অমনি বাড়িয়ে বলে, রোগ না হলেও বলে রোগ হয়েছে ; সামান্য একটু সর্দ্দি জ্বর হলে বলবে ব্রংকাইটিস, মচকিয়ে বুকে পিঠে ব্যথা হলে বলবে নিউমোনিয়া। ছেলে মানুষ তুই, ওদের চালাকি বুঝবি কি করে ? ওদের মতলব কি তা জানিস ? যাতে তাকে বেশী কল দেওয়া হয়, কারণ, টাকা বেশী পাবে। আমি তোকে এই জন্যই বারণ করেছিলুম না—ডাক্তার জানিস নে, অনর্থক উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলবি ? দেখ, বুড়োর কথা সত্যি হয় কি না ?"

কিন্তু এ কথায় পূরবী ভুলিল না, সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল "না দাদামশাই, তোমার চেহারাও বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, তুমি দেখতে পাচ্ছো না—তাই - "

দাদামহাশয় তাহাকে তাড়াইয়া গেলেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন "আমার শরীরের অবস্থা আমি বুঝব না

তো বুঝবে কি ওই ডাক্তারটা? একটা নল বুকে পিটে বসালেই সে আমার চেয়ে বেশী জেনে গেল আর কি? যা যা তোর কাজ কর গে যা, বিড়ালটাকে খাওয়া গে। রান্নাঘরে কি খুটখুট করে নড়ছে, হয় তো সে পোড়ারমুখী গিয়ে পেটের জ্বালায় দুধ চুরি করে খাচ্ছে। খাবে নাই বা কেন? তুই তো তাকে পেট ভরে খেতে দিবি নে, কাজেই তাকে চুরি করে খেতে হয়। সত্যি যদি খায়, তা হলে কিন্তু কখ্খনো বলতে পারবি নে বিড়ালে মাছ খেয়েছে, দুধ খেয়েছে।"

পূরবী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল "না, কিছু খেতে পারবে না দাদামশাই, সব ভাল করে ঢাকা আছে। কিন্তু দাদা মশাই—"

"আবার দাদামশাই? নাঃ, এমনি করে বিরক্ত করে যদি মারিস—তবে আমি আর বাঁচব কয়দিন বল দেখি? তুই এমনি করেই তো আমায় খাচ্ছিস! নে, কাজ না থাকে ওই বইখানা নে দেখি, কাল বিকালে লাইব্রেরী হতে তোর পড়ার জন্যে এনেছিলুম; তা তুই যা মুখ ভার করে থাকিস, আমার মোটে সাহস হয় না তোর কাছে দিতে।"

পূরবী বইখানা লইয়া আসিয়া বসিল, স্নেহের সুরে বলিল, "না দাদু, আর আমি কক্ষনো তোমার অবাধ্য হব

না, আবার তেমনি হব, তেমনি আমরা দুজনে খেলা করব, বই পড়ব, তুমি ভাল হয়ে ওঠ দাদামণি।"

বিরক্ত বৃদ্ধ বলিলেন "আবার ওই কথা, আমার কি হয়েছে বল দেখি? তুই বড্ড বেশী বাড়িয়ে তুলেছিস পূরবী, ও রকম করলে আমি আর কক্ষনো তোর সঙ্গে কথা বলব না।"

"না, না দাদামশাই, আর কক্ষনো ও সব কথা মুখে আনব না, আর বলব না।"

পূরবী নিজের বেদনা ভুলিয়া দাদামশায়ের বেদনা দূর করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। যাহাতে তাঁহার অণুমাত্র কষ্ট না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিল। যে হাসিকে সে বিদায় দিয়াছিল, সেই হাসিকে সে আবার ফিরাইয়া আনিল, আবার তেমনি খেলিতে পড়িতে লাগিল।

পূরবী তাঁহাকে এক একদিন ছাদে লইয়া গিয়া বসিত। সে দিনে সন্ধ্যার সময় দাদামহাশয়কে ছাদে বসাইয়া তাঁহার প্রিয় সেতারটী তাঁহার হাতে দিয়া বাজাইবার জন্য দৃঢ় অনুরোধ করিয়া বসিল।

বহুকাল তিনি সেতার বাজানো বন্ধ করিয়াছেন, পূরবীর বিবাহের পর এই দুই বৎসর তিনি সেতারে হাত দেন নাই। মাকড়সার জালে ও ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ আবরিত

করিয়া সেতারটী দেওয়ালেই ঝুলিতেছিল, বহুকাল পরে আজ সে আবার জলধরের হাতে পড়িল।

কিন্তু সুর যে ঝঙ্কারিয়া উঠে না। যে সুরে সে গান গাহিত, আনন্দের সে সুর যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন "কি করতে আর সেতার দিলি দিদি, এতে যে কোন সুরই উঠাতে পারছি নে।"

ধরা ধরা কণ্ঠে পূরবী বলিল "পারবে দাদা, পারবে। দুইটী বছরে সুর বেসুরে চলে গেছে, একটু চেষ্টা কর, এখনি সে সুর মিলে যাবে দাদামশাই।"

সেতারে সুর উঠিল, কিন্তু এ তো সে সুর নয়। যে সুরের তালে তালে আনন্দে হৃদয়ের রক্ত উচ্ছলিত হইয়া উঠিত, সে সুর কোথায় গেল? এ যে কাঁদনভরা সুর, বেদনাভরা গান, আহা হা, সে আনন্দ কই রে, সে দিন কই?

সুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়া নামিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল; পূরবী গোপনে চোখ মুছিল।

"দাদু, এ কি সুর এনে ফেললে সেতারে, এ যে কান্না ভরা, ব্যথায় মাখা। সে সুর তোমার কোথায় গেল দাদু?"

রুদ্ধকণ্ঠে দাদামশাই উত্তর দিলেন "হারিয়ে ফেলেছি

দিদি, যা হারিয়ে গেছে তাকে আর খুঁজে পাচ্ছি নে। এ জীবনটায় একটানা লোকসানই চলেছে রে, লাভ কিছুতেই নেই। অদৃষ্টে লোকসান অনিবার্য্য বলে— নিজের যা সঞ্চিত ছিল, তাও একে একে হারিয়ে ফেলছি। কত লোকে হারানো জিনিস আবার খুঁজে পায়, আমি তা কখনও পাইনি দিদি, আর পাবার আশাও নেই। অনেকখানি পথ চলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এখন তীরে এসে বসে পড়েছি। এখন মনে করছি কত ছিল, কত গেছে, কিছু কখনও পাইনি। পাবার আশা করিনি যে, এমন কথা সাহস করে এখনও আমার বলবার ক্ষমতা নেই।"

"কি পাবার আশা করেছিলে দাদামশাই?" পূরবীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল।

ধীর কণ্ঠে দাদামহাশয় বলিলেন "সব হারিয়ে আসার পথেও তবু যে কি আশা করেছিলুম, দিদি, সে কথা বলা ভার। মরতে বসেও মানুষে আশা তো ছাড়ে না ভাই। জলে ডুবে মরছে, তবু একটা খড় পেয়েও আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। আর সে সব ব্যর্থ কথা বলে কি কাজ হবে দিদি, কিছু ফল নেই।"

"চৌধুরী মশাই—বাড়ী আছেন কি?"

পূরবী সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল "কে তোমায় ডাকছে দাদামশাই ?"

হতাশ সুরে দাদামশায় বলিলেন "কে আর ডাকবে ?"

নিচের পথের উপর হইতে আবার কে ডাকিল "চৌধুরীমশাই—"

"চল দাদামশাই, তোমায় নিচে যেতে হবে। কে ভদ্রলোক ডাকছেন দেখা তো দরকার।"

দাদামহাশয়কে বাহিরের ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

জলধর দরজা খুলিয়া দিলেন, দরজায় দাঁড়াইয়া বনমালী।

কি কার্য্য ব্যপদেশে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এই সময়টায় একবার দুঃখিনী পূরবীকে দেখিয়া যাইবার প্রলোভন তিনি এড়াইতে পারেন নাই। আজই তাঁহার ফিরিয়া যাইবার জন্য ভবশঙ্করের আদেশ ছিল, তিনি সে আদেশ লঙ্ঘন করিবেন ভাবিয়াছিলেন। মনটা তাঁহার কি রকম অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছিল, প্রভুর আর সব আদেশ তিনি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এ আদেশ তিনি পালন করিবেন না।

ধনীকে দেখিতে সবাই আছে, দরিদ্রের যে কেহই নাই। ধনী অনায়াসে সমাজের মাথা হইয়া দাঁড়ায়, ধরিতে গেলে সমাজকে সে নিজের ইচ্ছানুসারেই চালিত করে। দরিদ্র সেই সমাজের পেষণে পেষিত হইয়া নীরবে শুধু চোখের জলই ফেলিয়া যায়।

দরিদ্রের দুঃখ বনমালী বুঝিতেন, সমাজের পীড়নে পীড়িতদের ব্যথা তিনি বুক দিয়া অনুভব করিতেন। তাই সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য, সমাজ সংসারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু হায়, নগণ্য লোক তিনি, সমাজ তাঁহার কথা কাণেই তুলে না। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা অনুভব না করিয়াই হাসিয়া একেবারে উড়াইয়া দেয়। যদি কোনও একজন ধনী পৃষ্ঠপোষক তিনি পাইতেন, তাঁহার কথা সমাজ শুনিত, তাঁহার যুক্তিমত চলুক বা না চলুক, অন্ততঃ ভাবিয়াও দেখিত বটে। প্রভু ভবশঙ্কর তাঁহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। পরস্পরে বিপরীত পথে চলিলেও, তিনি যথার্থই প্রভুর ভক্ত ছিলেন, ভবশঙ্করের সংসারই তাঁহার আপন সংসার ছিল।

আজ এই বাড়ীখানার দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার মনে ভবশঙ্করের রুদ্র মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল।

যদি কোনও ক্রমে তিনি শুনিতে পান বনমালী ১২নং কলুটোলায় গিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি কি রক্ষা রাখিবেন ?

কিন্তু পিছাইবারও ইচ্ছা ছিল না, যাহাই হোক তিনি সহ্য করিবেন, যে দণ্ডই ভবশঙ্কর দিন না কেন, তিনি তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন।

দরজা খুলিয়া মাত্র বনমালী দেখিলেন, সম্মুখে জলধর। দুই বৎসর আগে তিনি যে জলধরকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত, ইঁহার আকৃতি মিলাইয়া বনমালী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। দুইটা বৎসর মাথার উপর দিয়া যেন বহিয়া গিয়াছে, তাই সে সটান দীর্ঘ দেহ আর নাই, তিনি অনেকটা কাবু হইয়া পড়িয়াছেন।

"প্রণাম করি চৌধুরী মশাই—"

তিনি প্রণাম করিতেই জলধর অত্যন্ত সচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন, লোকটী যে কে তাহা মোটে চিনিতেই পারিলেন না।

বনমালী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমায় চিনতে পারছেন না বোধ হয়? আমি ভবশঙ্কর বাবুর দেওয়ান বনমালী রায়। দু বছর আগে নূরপুরে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, মনে করে দেখুন।"

"নূরপুর,—ভবশঙ্কর বাবুর দেওয়ান—"

জলধর চমকাইয়া উঠিলেন, কতক্ষণ তিনি কথা বলিতে পারিলেন না; নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন "আসুন, আসুন, বসুন। সত্যই আমি চিনতে পারি নি। চোখে মোটেই আর দেখতে পাইনে বনমালী বাব, চিনবই বা কি করে? এই যে, এই তক্তাপোষে বসুন।"

বসিতে বসিতে বনমালী বলিলেন, "এই দুই বছরেই আপনার চোখ এত খারাপ হয়ে গেল চৌধুরী মশাই? তখন তো বেশ দেখতে পেতেন দেখেছি।"

নৈরাশ্যের হাসি বৃদ্ধের মুখে ফুটিয়া উঠিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "সে এক দিন গেছে বনমালী বাবু। দিন তো যাচ্ছে, সে ফিরে আসছে না। দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল, চোখের দৃষ্টি, দিন দিন সবই যাচ্ছে। এখন বয়েস যাচ্ছে বনমালী বাবু, বয়েস বাড়ছে না।" আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ব্যথিত বনমালী তাঁহার অন্ধকার শোকাচ্ছন্ন মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন, নিজের অজ্ঞাতসারে কখন একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন তাহার ঠিক নাই।

"তার পর—সেখানে সব ভাল আছেন? পবিত্র, তার বাপ, মাসীমা—?"

বনমালী ঘাড় কাত করিয়া বলিলেন, "সবাই ভাল আছে।"

বৃদ্ধ আত্মভোলা এক এক করিয়া কত প্রশ্ন করিয়া চলিলেন তাহার ঠিকই নাই, বনমালীও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পবিত্রের কথা আসিয়া পড়িল—"বনমালীবাবু, পবিত্র আর একবারও কলকাতায় আসে নি, আজ দু বছরের মধ্যে?"

বনমালী মিথ্যা বলিতে পারিলেন না, এই সরল হৃদয় মৃত্যু-পথযাত্রী অতি বৃদ্ধের কাছে মিথ্যা কথা বলিতে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল, তিনি বলিলেন "হাঁা, সে তো প্রায়ই আসে।"

"প্রায়ই আসে—?"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন। প্রায়ই আসে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি? বিশাল কলিকাতা সহর, ইহার মধ্যে তাঁহারা দুটিতে কোথায় এক কোণে পড়িয়া আছেন, কে তাহাব খোঁজ রাখে? এখানে আসিলেই যে তাঁহাদের কাছে তাহার আসিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই

তাহাদের সহিত তাহার তো সব সম্পর্কই উঠিয়া গিয়াছে, তবে সে আসিবেই বা কেন?

সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে, হায় রে, কথাটা বলা যত সহজ, কাজে যদি তাহাই হইত! দাগ যে বুকের মাঝে একেবারে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, এ যে কিছুতেই উঠিতেছে না। চিতা যে জ্বলিয়াছে, এ অগ্নি যে কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইতেছে না। সম্পর্ক নাই, জোর করিয়া এই কথাটা বলিলেই কি হইল, তাহাই কি সম্ভব হয় কখনও?

কম্পিত কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন "বনমালী বাব—"

বনমালী উত্তর দিলেন "বলুন—"

চকিতে বক্তব্যটাকে চাপিয়া জলধর বলিলেন "না, বলছিলুম কি, আজকার দিনটা এখানে থেকে যাবেন তো?"

তিনি যে কি একটা ব্যথাভরা কথা প্রকাশ করিতে গিয়া হঠাৎ তাহা চাপিয়া গেলেন, বুদ্ধিমান বনমালী তাহা বুঝিলেন; সে প্রসঙ্গে আর কথা না তুলিয়া তিনি বলিলেন "এসেছি যখন অবশ্যই থেকে যাব বই কি? আমি যে আমার নির্ব্বাসিতা মাকে একবার দেখতে এসেছি চৌধুরী মশাই, শুধু দেখেই যাব না, আমার মায়ের হাতের রান্না পর্য্যন্ত খেয়ে যাব। সমাজ খায় নি, তা বলে আমায় অন্ন

দিতে তিনি যেন সঙ্কুচিতা না হন। আমি ভবশঙ্কর নই, আমি পবিত্র নই, আমি সমাজ ছাড়া লোক, আমি মায়ের ছেলে। মা যাই হোন না কেন, ছেলের কাছে তিনি চিরবন্দ্যা। একবার ডাকুন আমার মাকে, আমিই তাঁকে বলছি, শীগ্‌গির করে আমায় চারটী ভাত দিতে হবে।”

লজ্জিতা কুণ্ঠিতা পূরবী কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না, নিজের কথা মনে করিয়া নিজেই সে মরমে মরিয়া যাইতেছিল, নিজের হীনতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন স্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

বনমালী নিজেই গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, হাসি মুখে বলিলেন “তোমার তো এত কুণ্ঠা লজ্জা সাজবে না মা লক্ষ্মী? ছেলেকেই যদি লজ্জা করে চলবে তুমি, তা হলে অসঙ্কুচিতত্তা তুমি লাভ করবে কোথায়? ওরকম করলেই চলবে না মা, বেশ বুঝছি এই বুড়োকে তাড়ানর কৌশল তোমার। কিন্তু বুড়ো ছেলে তোমার বড় নাছোড় বান্দা মা; সে মায়ের আঁচল কিছুতেই ছাড়বে না। তোমায় ভাত রাঁধতেই হবে, আমার কোলে ভাত দিতেই হবে। না খাইয়েই যে তাড়াবে সে হতে পারবে না।”

পূরবী নত মুখে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “আমার হাতের ভাত আপনি খাবেন কাকা?”

তাহার কাকা সম্বোধনে অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিয়া বনমালী বলিয়া উঠিলেন "খাব না, আলবৎ খাব। তুমি একবার ভাত দিয়ে দেখ না মা, হাঁড়ি আজ তোমার কাবার করে ছাড়ব। পেটে আমার কি খিদে তা মা হয়ে জানতে পারছ না মা?"

"কিন্তু আমি যে পতিতার মেয়ে কাকা—"

রুদ্ধকণ্ঠে বনমালী বলিয়া উঠিলেন "আবার সেই পচা পুরানো কথা, শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। এ জগতে পতিতই বা কে আর মহৎই বা কে মা? পতিত মহৎ এক জায়গা হতে এসেছে, এক জায়গায় যাবে, কার্য্য-কালে সেখানেই তার বিচার হবে, সে জন্যে আমাদের তো এতটা মাথা ঘামানোর কোনও দরকার দেখছি নে। তোমায় আমরা পেয়েছি, তোমার পতিতা মাকে তো পাইনি যে, তার পাপ ওজন করে দেখতে যাব। মায়ের বাপের পাপে সন্তান যদি ঘৃণিত হয়, তাকে যদি দণ্ড দেওয়া হয়, দণ্ডদাতার জন্যেই যে অনেক দণ্ড তোলা থাকবে মা, পরিণামে সে দণ্ড তো কেউ রদ করতে পারবে না।"

অশ্রুসজল নেত্রে পূরবী নত হইয়া বনমালীর পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চকিতে

কখন সে গোপনে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়াছিল, বেশ সংযত শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল "বসুন কাকা, আমি ভাত বসিয়ে দিয়ে আসি।"

"শীগ্‌গির কিন্তু মা, বড্ড খিদে পেয়েছে—।"

প্রসন্নমনে পূরবী চলিয়া গেল।

১০

সে বিবাহটা যে বিবাহই নয়, ভবশঙ্কর তাহা সপ্রমাণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কাঁটালপাড়ার বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বাবুর একমাত্র সুন্দরী মেয়েব সহিত পুনর্ব্বার পবিত্রের বিবাহ দিবার জন্য তিনি এবার নামিয়া পড়িলেন।

পবিত্রের মুখ শুকাইয়া গেল, আবার বিবাহ? তাহার ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ যে হইয়া গিয়াছে।

অসহায়ের সহায় মাসীমাকে সে গিয়া ধরিল "তোমাকেই এর একটা উপায় করতে হবে মাসীমা, নইলে চলবে না।"

মাসীমা বলিলেন "আমি কি করব বাবা?"

"বিয়েটা যেমন করেই হোক বন্ধ রাখতে হবে।"

ইদানীং পবিত্র পূর্ব্বের স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়াছিল। আগেকার মতই সর্ব্বদা হাসিত, পড়াশুনা করিত, মাসীমাব কাজে সাহায্য করিতে আসিয়া অনভ্যস্ত হস্তে একটা

করিতে গিয়া আর একটা করিয়া অপ্রতিভ হইয়া হাসিত। সে যে এখনও সেই কয়টা বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতিখানা মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিয়াছিল, উমা তাহা জানিতেন না। শেষ কালটায় পবিত্রের ছেলেমানুষী ভাবটা পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া তিনিও সকলের মত ভুল বুঝিয়াছিলেন।

বিস্মিত ভাবে তিনি পবিত্রের পানে চাহিলেন, পবিত্র অপ্রতিভভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

উমা বলিলেন "বিয়ে করবিনে, সে প্রতিজ্ঞা এখন তুই অটুট রাখতে চাস্ পবিত্র ?"

পবিত্র অন্যদিকে মুখ রাখিয়াই উত্তর দিল "হ্যাঁ মাসীমা। আমার বিয়ে তো হয়েছে, আবার বিয়ে করা পাপের কাজ নয় কি ?"

"কিন্তু সে স্ত্রীকে তুই আর গ্রহণ করতে পারবিনে তো পবিত্র, নিজের মুখেও তো বলিছিস্।"

পবিত্র অন্তরে দৃষ্টিলাভ করিয়া পূরবীর মূর্ত্তিখানা একবার দেখিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "সত্যি সে কথা, আমি তাকে গ্রহণ করতে পারব না। কিন্তু তবুও মাসীমা, আমি আর বিয়ে করতে পারব না, তুমি একবার বাবাকে কোনও রকমে এ কথাটা বললে—"

উমা শিহরিয়া বলিলেন "তুই ক্ষেপেছিস পবিত্র, আমি দাদামণিকে এই কথা বলতে যাব? তাঁর সামনে আমি মোটে কথাই বলতে পারিনে, এ কথা বলব কি করে?"

পবিত্র ছাড়িল না, বিশেষ করিয়া তাঁহাকেই ধরিয়া বসিল, "পারব না বললে চলবে না মাসীমা, তোমাকেই এ কাজ করতে হবে, তুমি ছাড়া আর কেউই পারবে না। আমি বলতে পাবতুম মাসীমা, কিন্তু ভেবে দেখলুম, আমার বলা উচিত নয়, বাবাকে সেটা স্পষ্ট ঝেড়ে ফেলা হয়। বাবার আত্মাভিমানে একটা দারুণ আঘাত লাগবে, যে আমি নিজে তাঁর মুখের 'পরে জবাব দিয়ে দিলুম। মাসীমা—"

এমন আর্ত্তভাবে সে মাসীমা বলিয়া ডাকিল যে, মাসীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তাই হবে রে, তাই বলব। আমিই না হয় কথাটা তুলে দেব কাণে, তিনি আমায় তার পর যাই বলুন। তোকে আমি স্পষ্টতঃ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেব না, তাঁর সে রাগের ঝড়টা আমার ওপরেই প্রথমটা এসে পড়ুক, আমার দ্বারা প্রতিহত হয়ে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, তোদের বেশী ধাক্কা দিতে পারবে না। আচ্ছা যা, আমি বলব এখন, তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক গিয়ে।"

সমস্ত দিনের মধ্যে অন্তঃপুরে ভবশঙ্করের পদার্পণ হইত একটীবার মাত্র, আহারের সময়। উমা ভাবিয়া রাখিলেন, সেই সময় কথাটা তুলা যাইবে।

কিন্তু ভবশঙ্করের গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়াই তাঁহার বক্তব্য তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার এতখানি বয়স হইয়াছে, আজও ছোটবেলার মত তিনি সহসা ভবশঙ্করের সম্মুখে বাহির হইতে পারিতেন না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে কণ্ঠ জড়াইয়া আসিত।

কিন্তু না বলিলেও যে নয়, পবিত্রের কাছে তিনি যে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

বলি বলি করিতে করিতে ভবশঙ্করের আহার শেষ হইয়া গেল, তিনি গণ্ডূষ করিলেন।

আর চুপচাপ থাকা সঙ্গত নয়। ভবশঙ্কর এখনই গিয়া শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বাররুদ্ধ করিবেন, ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করিয়া আবার বাহিরে যাইবেন।

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তাড়াতাড়ি ডাকিলেন "দাদামণি —একটা কথা—"

ভবশঙ্কর বলিলেন "কি বলছ উমা?"

উমা ধীরে ধীরে বলিলেন "পবিত্রের ইচ্ছে—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন "কি পবিত্রের

ইচ্ছে ? যা বলবে ঝাঁ করে বলে ফেল, আমি আর বসতে পারছি নি।”

তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূযুক্ত গম্ভীর মুখ, ততোধিক গম্ভীর কথা শুনিয়াই উমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করিতেছিল, অতি কষ্টে তিনি বলিয়া ফেলিলেন, “পবিত্রের ইচ্ছা নয় যে, সে এ বিয়ে করে, সে আমায় তাই—”

“বস করো” গর্জ্জিয়া উঠিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “বলতে চাও, তার ইচ্ছে সেই পতিতা-কন্যাকে নিয়ে এসে সংসার পাতবে, আমার পবিত্র ভিটে কলঙ্কিত করবে ?”

কাঁপিয়া উঠিয়া উমা বলিলেন “না, সে সে-কথাও বলছে না। সে সে-স্ত্রীকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু এ বিয়েও করবার তার মত নেই।”

ভবশঙ্কর হাসিলেন, তখনই মুখের সে কর্কশ হাসি মিলাইয়া গেল—“আশ্চর্য্য কথা উমা, তার মতলব আমি বেশ বুঝেছি। সে বিয়ে করবে না, তার মূল উদ্দেশ্য সে সেই বেশ্যাকন্যাকেই চায়। আমার বংশের কলঙ্ক হয়ে জন্মেছে সে, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে এ স্পর্দ্ধা তার কখনই সাজবে না।”

তাঁহার স্বর অত্যন্ত কঠিন।

“আচ্ছা, তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও গিয়ে, আমি উপরের ঘরে চললুম।”

অসংযত পদে খট খট খড়মের শব্দ করিতে করিতে তিনি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

তিনি তো গেলেন, কিন্তু পবিত্র যায় কি করিয়া? পিতা যে কঠোর বিচারক, বার বার তাহার অপরাধ তো তিনি মার্জ্জনা করিবেন না। দুইবার গুরুতর অপরাধ করিয়া সে মার্জ্জনা পাইযাছে, এবারে তাহার দণ্ড নিশ্চিত। সে দণ্ডের কথা ভাবিয়া পবিত্র ভীত হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু ওই যে "পবিত্র" আহ্বান—সাধ্য কি তাহার, চুপ করিয়া থাকে সে? তাহাকে যাইতেই হইবে যে, লুকাইয়া থাকার ক্ষমতা থাকিয়াও যে নাই। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া আনে, ভবশঙ্করের আহ্বানও তেমনি সকলকে আকর্ষণ করিয়া কাছে আনিয়া ফেলে।

পায়ে পায়ে তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইল, সেই দরজাটীর কাছে আসিয়াই সে থামিয়া গেল।

কর্কশ কণ্ঠে পিতা ডাকিলেন "এ দিকে এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

পবিত্র কক্ষে প্রবেশ করিল।

"তোমার মাসীমাকে তুমি যে কথা বলেছ, তা শুনলুম। তোমার উদ্দেশ্য কি, আমি তা শুনতে চাই।"

পবিত্র নীরব।

অন্তরের ক্রোধরূপ বহ্নি পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, বুদ্ধিমান ভবশঙ্কর তাহাকে দমন করিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন "তোমার ইচ্ছা বেশ্যাকন্যাকে আবার এ ঘরে ফিরিয়ে আনা ?"

পবিত্র রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "না বাবা, আমি আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনার অনুমতি না পেলে আমি তার মুখ দেখব না। আমি আপনার ছেলে বাবা, আমার কথা, আমার প্রতিজ্ঞা অটল।"

একটু খুসি হইয়া ভবশঙ্কর বলিলেন "হ্যাঁ, সে প্রতিজ্ঞার কথা যেন মনে থাকে, কখনও যেন ভুল না হয়। আমার পবিত্র ভিটে বেশ্যাকন্যার পদস্পর্শে কলঙ্কিত হ'য়েছিল, যদিও সে ঠাকুর পূজার জোগাড় করেনি তবু সে সে-ঘরে প্রবেশ লাভ করেছিল, এর জন্য আমায় রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। আবার সেই বেশ্যাকন্যা আমার ভিটেয় পা দিবে—কখনও তা হতে পারবে না।"

পবিত্র নত মুখে বসিয়া রহিল।

তামাক টানিতে টানিতে ভবশঙ্কর বলিলেন "তার পর বিয়ে করতে নারাজ কেন, শুনি ?"

পবিত্র নীরব।

নলটা মুখ হইতে সরাইয়া ভবশঙ্কর বলিলেন "চুপ করে

রহিলে যে ? একটা কোনও কারণ আছে তো যার জন্যে তুমি বিয়ে করতে চাও না। সে কারণটা আমায় বুঝিয়ে বলে দাও, তবে তো বুঝব।"

ধীর স্বরে পবিত্র বলিল "কারণ কিছু নেই।"

"কিছু নেই ?"

ভবশঙ্কর বিস্মিত ও রাগত হইয়া উঠিয়াছিলেন, রূঢ় দৃষ্টিতে পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন "কারণ কিছু নেই, এ কথা বলে বুঝাতে পারো উমাকে, তার চোখে ধূলো তুমি সহজেই দিতে পার, আমায় পার না তা জানো ? আমি কিন্তু সহজেই তোমায় ছেড়ে দিব না পবিত্র, এর কারণ আমি নিশ্চয়ই শুনব, তবে তোমায় ছাড়ব।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া পবিত্র বলিয়া উঠিল "সত্যি কথা বলছি বাবা, কারণ আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি নে। আমায় ক্ষমা করুন বাবা, এবারের মতন আমায় ছেড়ে দিন, আমি বিয়ে করব না, করতে পারব না। আপনি যদি তাদের কিছু না বলতে পারেন, আমায় আদেশ দিন, আমি নিজে গিয়ে তাঁদের বলে আসছি এ বিয়ে হবে না। সব দোষ আমি আমার ঘাড়েই নিচ্ছি বাবা।"

ভবশঙ্কর গর্জ্জিয়া বলিলেন "কিন্তু—যত দিন আমি বেঁচে থাকব, তুমি অপকর্ম্ম করলে কথা শুনতে হবে আমাকেই,

আর তোমার কাজের ফল আমায় ভোগও করতে হবে। শোন পবিত্র, বার বার আমায় তুমি লোকের কাছে লাঞ্ছিত অপমানিত করে এসেছ। এবারেও ব্যাপারটাকে তুমি যত ছোট বলে মনে করছ, সত্য এটা তত ছোট নয়। দেশে দেশে এ বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র গেছে, আজ বিকেল হতে আত্মীয়েরা আসতে আরম্ভ করবেন খবর পেয়েছি। আর পাঁচদিন মাত্র বাকি আছে বিয়ের। এখন এ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে যাওয়া যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ, সেটা যে তোমার মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলেকে আমায় বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে, এইটাই বড় দুঃখের কথা। দেখ, ছেলে মানুষি সব সময়ে সকল জায়গায় খাটে না, মাথা ঠিক করে কাজ করতে হয়। বেশ্যাকন্যা তোমার স্ত্রী হতে পারে না, তোমার যথার্থ স্ত্রী হবার অধিকার আছে এই মেয়েটীর! যাও, বেশী ছেলে মানুষি করো না, বয়েস হয়েছে একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ করতে শেখ। তোমায় এ বিয়ে করতেই হবে, এই আমার মোট কথা। ও সব উড়ো ভাবনা ঝেড়ে ফেলে যথার্থ ভাবনা ভাব গিয়ে।”

পবিত্র কি বলিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না, তাই তেমনই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাছে আবার সে কোনও কথা বলিয়া বসে তাই ভবশঙ্কর

গড়গড়া সরাইয়া রাখিয়া একটা হাই তুলিয়া বলিলেন "যাও যাও, বড় ঘুম আসছে, আর বসতে পারছিনে। কই উঠলে পবিত্র?"

একরূপ প্রায় জোর করিয়া পবিত্রকে উঠাইয়া দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাহিরে আসিয়াই পবিত্রের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, দরজায় আঘাত করিযা সে ডাকিল "বাবা—?"

"এখন যা বাপু, একটু ঘুমিয়ে উঠি, তার পরে না বলার থাকে, বলিস।"

অগত্যা ভগ্নমনে পবিত্র ফিরিল।

১১

কিছুতেই না, ভবশঙ্করের কথা কিছুতেই নড়চড় হইবে না। এ কি যে সে লোক—যে কথা মত কার্য্য করিবে না? ভবশঙ্করের যে কথা সেই কাজ।

বাড়ীতে বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল। বড় জাঁকের বিয়ে, গ্রামে একটা সোরগোল উঠিল। আত্মীয় আত্মীয়াতে বাড়ী ভরিয়া উঠিল।

পবিত্রের মলিন শুষ্ক মুখখানার পানে চাহিয়া উমা কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। কিন্তু তাহা হইলই বা, ভবশঙ্করের কঠিন আদেশ পালন করিয়া যাইতেই হইবে, ভবশঙ্করের কথার উপরে কথা বলে এমন ক্ষমতা কাহার?

পবিত্রেব মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া বনমালী সাহসে ভর করিয়া একবার ভবশঙ্করের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পড়িলেন, মাথা চুলকাইয়া খানিকটা অ্যাঁ উঁ করিয়া শেষে বলিলেন "বাবু, একবার পবিত্রের মুখের পানে তাকিয়ে দেখে তার পরে কাজটা করলে হতো না কি? পবিত্রের মনে মোটে শান্তি নেই, সে কেবল লুকিয়ে—"

ভবশঙ্কর তাঁহাকে তাড়াইয়া গেলেন, "যাও যাও, তোমাকে আর তার পক্ষ সমর্থন করতে আসতে হবে না বনমালী নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে। আমার ছেলে, আমি যা খুসি করব, তাতে কারও কথা বলতে আসার দরকার দেখছিনে।"

তাই বটে, আজ পবিত্র তাঁহার নিজের ছেলে, কিন্তু এমন একটা দিন আসিয়াছিল, যে দিন এই দাম্ভিক ভবশঙ্করই বনমালীর দুখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন "পবিত্র শুধু আমার একারই না বনমালী, বরং আমার চেয়ে পবিত্র তোমাকেই জানে, চেনে—ভালবাসে—হায় রে! আজ সেই কি না বলিতেছেন, পবিত্র আর কাহারও নহে, আর কাহারও পবিত্রের সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার নাই; পবিত্র আজ তাঁহার সম্পূর্ণ একার, পবিত্রের উপর অধিকার তাঁহারই।

ধীরে ধীরে বিশুষ্ক মুখে বনমালী সরিয়া গেলেন।

দুপুর বেলা আহারাদি সমাপ্তে বাহিরে আসিবেন, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উমা বলিলেন "দাদামণি, ছেলেটার পানে একবার চেয়ে দেখেছেন কি? সে যে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, হাসি তার মুখ হতে মিলিয়ে গেছে—"

হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিয়া উঠিলেন "উমা!—"

উমা একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন, তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন।

তেমনি ঝাঁঝালো সুরে ভবশঙ্কর বলিলেন "তোমাদের মনে করে রাখা উচিত, পবিত্রের সম্বন্ধে আমি কতটা সতর্ক আছি, পবিত্র আমার কি জিনিস। আমি দেখছি তোমরা সকলেই আমায় উপদেশ দিতে আসছো, যেন পবিত্রকে আমি বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছি। দেখ, একটা কথা বলি শোনো, সতর্ক হয়ে কথা বলো, যা তা মুখে আসবে আর বলে যাবে, তা কোরো না। পবিত্রকে মানুষ করেছ বলেই যে পবিত্র তোমার আপনার, আমার কেউ নয় এতো না। তোমাদের বাপ ছেলেব মাঝখানে দাঁড়াতে আসা একেবারেই অসঙ্গত, এটা মনে রেখো।"

উমার মনে কথাটা বড় জোরেই গিয়া বাজিল, মনে হইল বুকখানা শতধা হইয়া যায়। হা রে নারী, তুই শুধু অপার স্নেহ ঢালিয়া মানুষই করিয়া গিয়াছিস, নিজের সবটাই দান করিয়া বসিয়াছিল, প্রতিদান পাওয়া দূরের কথা, তোকেই যে ছাঁটিয়া ফেলা হইতেছে। কোথায় ছিলেন সেদিন ভবশঙ্কর - যেদিন পবিত্রের মা শিশু পবিত্রকে দ্বাদশবর্ষীয়া ভগিনীর হাতে দিয়া বড় শান্তিতে

চক্ষু মুদিয়াছিলেন? বালিকা উমা সেই শিশুকে কি করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। কত বিনিদ্র রাত্রি গিয়াছে, কত দিন আহার পর্য্যন্ত হয় নাই। পবিত্রের অসুখ হইলে সে ভোগটা ভোগ করিত কে? ভবশঙ্কর ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া খালাস, উমার অক্লান্ত সেবা,—তিনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন? বোধ হয় নয়। যদি লক্ষ্য করিতেন, তবে আজ সেই পবিত্র উমার কেহ নয়,—এ কথাটা এমন করিয়া কি বলিতে পারিতেন? হায় রে নারী, শুধু দিয়াই গিয়াছিস, তোর সে দেওয়া একেবারেই অসার্থক হইয়া গেল রে!

হোক, তাই হোক, ভগবান, তাই হোক। পিতা-পুত্রে মিলন হোক, ইহার বেশী প্রার্থনার জিনিস আর কি থাকিতে পারে? উমাও তো তাই চান। পবিত্রের স্ত্রী আসুক, তাহার হাতে তাহার সংসার বুঝাইয়া দিয়া তিনি দুদিন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

বাড়ীর ভিতরে তো কাক চিল বসিবার যো নাই। ছেলেপুলের চ্যাঁ ভ্যাঁ, তাদের মায়েদের চীৎকার, কোথাও গল্প, কোথাও হাসি, কোথাও কান্না। পবিত্র সব ছাড়িয়া তেতালার ছোট ঘরটী আশ্রয় করিয়াছে। সে একেবারে নিচে আসাই প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

বিবাহের তখনও দিন তিনেক দেরী, উমা বারাণ্ডায় বসিয়া আত্মীয়াদের সহিত গল্প করিতেছিলেন। পবিত্র যে মোটেই নিচে আসে না, একটীবার দেখা করে না, জনৈকা মহিলা ইহাই লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। উমা তাড়াতাড়ি পবিত্রের দোষ ঢাকিবার জন্য বলিতেছিলেন, "কি বলব দিদি, ছেলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না। বলছি বাপু অমন কাণ্ড আকছার হয়ে আসছে, তোরই নতুন নয়, তবু সে বলে - না মাসীমা, আমি বেরুতে পারব না। কি বলব ভাই, আস্ত পাগল, এত বিদ্যে শিখেছে, তবু যদি ছেলেমানুষি যায়।"

কিশোরীর দল হাসিয়া উঠিল, বিকম্পিত প্রায় হাসিকে গোপন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর মুখে উমা বলিলেন, "সত্যি, ও অমনি পাগলা ছেলে। যেটা করতে নেই বলব, সেইটেই ঠিক করে বসবে। ওর মাকে প্রণাম করতে বলব, ছেলে আমায় নমস্কার করে বসবে।"

বলিতে বলিতে অনেকদিন আগেকার সস্ত্রীক পবিত্রের কথাটা মনে পড়িয়া গেল, তিনি হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন।

"মাসীমা—"

পিছনে সচকিতে তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির উপর

দাঁড়াইয়া পবিত্র। তাহার মুখখানা অত্যন্ত ভার, আব তেমনি আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; বড় বড় চক্ষু দুইটী অস্বাভাবিক আরক্ত, যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়।

সন্ত্রস্তা উমা বলিয়া উঠিলেন, "এই যে পবিত্র—"

কম্পিত কণ্ঠে পবিত্র বলিল "এদিকে এসো মাসীমা, কথা আছে শোনো।"

"কি কথা বাবা—" তাড়াতাড়ি উমা তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া পবিত্র বলিল, "আমার ঘরে চল মাসীমা।"

"এ কি রে পবিত্র, তোর হাতখানা এত গরম কেন? তোর মুখখানাও যেন কি রকম দেখাচ্ছে? তোর কি জ্বর এসেছে না কি? দেখি গাটা—"

একটু হাসিয়া তাঁহার হাতখানা সরাইয়া দিয়া পবিত্র বলিল "থাক মাসীমা, এখন গা দেখতে হবে না। চল তো আমার ঘরে, তার পর দেখো এখন। অনর্থক লোককে জানিয়ে কেবল ব্যস্ত করা হবে মাত্র।"

নিজের পা তাহার স্থিরভাবে পড়িতেছিল না, তথাপি উমাকে টানিতে টানিতে তেতালায় সে ছোট ঘরখানায় লইয়া গেল। উমাকে বসাইয়া তাঁহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া অত্যন্ত শ্রান্তভাবে সে হাঁফাইতে লাগিল।

উমা তাহার কোটের বোতাম খুলিয়া গাত্রের তাপ পরীক্ষা করিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বিবর্ণ মুখে বলিলেন, "ইস্ গা যে তোর পুড়ে যাচ্ছে পবিত্র, এতটা জ্বর হয়েছে, এ নিয়ে তুই নিচে গিয়েছিলি আমায় ডাকতে? এখান হতে কাউকে ডাকতে পাঠালেই হতো, তোর জ্বর হয়েছে শুনলে কি নিচে থাকতুম?"

শ্রান্ত পবিত্র বলিল "শুধু শুধু সকলকে ব্যস্ত করে—" বাধা দিয়া উমা বলিলেন, "শুধু শুধু? কি ভয়ানক গরম হয়েছে তোর গা, আমার কোলে মাথা দিয়ে আছিস, কোল যেন পুড়ে যাচ্ছে।"

"একটা বালিস দাও মাসীমা, তুমি শুধু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তা হলেই হবে এখন!"

উমা সন্ত্রস্তে বলিয়া উঠিলেন "ষাট বাছা আমার, আমার কোল থাকতে বালিস মাথায় দিবি কেন বাবা? এই তো বেশ শুয়ে আছিস, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া শুইয়া পবিত্র বলিল "অসুবিধে? বিলক্ষণ মাসীমা, তুমি বোধ হয় জানো না, তোমার কোলে মাথা দিয়ে শোব বলেই তোমায় নিজে গিয়ে ডেকে আনলুম। তিনদিন বাদে বিয়ে, আজ আমার জ্বর হয়েছে শুনে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠবে, তাই

কাউকে জানালুম না। কাল সকালেই আবার ভাল হয়ে যাব, রাত্রেই জ্বর ছেড়ে যাবে এখন, কিছু ভাবনা করো না মাসীমা।”

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মাসীমা বলিলেন “তাই হোক বাছা, তাই হোক। দামোদর করুন, রাত্রের মধ্যেই তোর জ্বরটা ছেড়ে যায়, কাল সওয়া পাঁচ আনার হরির লুট দিই আমি।”

বড় শান্তিময় কোল এ ;—পবিত্র নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া রহিল।

জ্বরের প্রবল যাতনা। অনেককাল পরে তাহার জ্বর হইয়াছে, চার পাঁচ বৎসর প্রায় জ্বর হয় নাই। জ্বরের যন্ত্রণায় যতই সে ছটফট করিতেছিল, উমা ততই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি ঠিক জানিতেছিলেন, দারুণ মনো কষ্টেই পবিত্র শরীরকে অবহেলা করিয়াছে, তাহার ফলেই এই জ্বর হইয়াছে। এখন ভালয় ভালয় জ্বরটা ছাড়িয়া গেলে যে বাঁচা যায়, আর তিন দিন পরে যে বিবাহ।

যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে পবিত্রের ঘুম আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে সে পূরবী—পূরবী করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

হায় রে অভাগা—

উমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। ধন্ত রে তুই পতিতা-কন্তা, সার্থক তোর জীবন গ্রহণ। একজনের অফুরন্ত ভালবাসা কি নিবিড় ভাবে তোকে বেষ্টন করিয়া আছে, ধন্ত তোর নারীজন্ম। জগতে সকলেই তোকে ঘৃণা করিয়াছে, সকলে তোকে তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু যে তোকে বরণ করিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এখনও পূর্ণরূপে জাগিয়া আছিস তুই।

"পবিত্র—বাবা—"

চেঁচাইয়া উঠিয়াই পবিত্রের তন্দ্রা দূর হইয়া গিয়াছিল, অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সে নিদ্রিতের ভাবে পড়িয়া ছিল।

তাহার এ ছলনাটুকু স্নেহময়ী মাসীমা সহজেই ধরিতে পারিলেন। তাহাকে লজ্জিত করিয়া তোলা তাঁহার উচিত নয় জানিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন, আর ডাকিলেন না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ভবশঙ্কর নিজের গৃহে আসিয়া পবিত্রকে ডাকিবার জন্ত ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন পবিত্র ঘুমাইয়া, উমা তাহার মাথা উপাধানে রক্ষা করিয়া অল্প অল্প বাতাস করিতেছিলেন। ভৃত্যকে বলিয়া দিলেন "বল গিয়ে পবিত্রের বড্ড জ্বর এসেছে, সে এখন যেতে পারবে না। কাল সকালে জ্বর ছাড়লে তার পরে যা হয় তাই বলবেন।"

পবিত্রের বড় জ্বর, ভবশঙ্কর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নিজেকে সংযত করিয়া রাখিবার প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সে চঞ্চলতা গোপন করিতে পারিলেন না, আহারের পর নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম সুখের আশা ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তেতালার ঘরের রুদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন "পবিত্র—"

ভেজানো দরজা খুলিয়া উমা বাহির হইয়া আসিলেন, চুপি চুপি বলিলেন "ডাকবেন না দাদামণি, ঘুমিয়ে পড়েছে, বড্ড যন্ত্রণার পরে একটু ঘুম এসেছে, এতে জ্বরটা ছাড়লেও ছাড়তে পারে।"

ব্যাকুল কণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিলেন "বড্ড জ্বর এসেছে ?"

শুষ্ককণ্ঠে উমা বলিলেন "উঃ, সে আর বলবার কথা নয়।"

ব্যগ্রভাবে ভবশঙ্কর বলিলেন "তবে মাথাটা ধুইয়ে দাও উমা, আমি শ্রীনাথ ডাক্তারকে একবার ডাকতে পাঠাই, এসে একবার দেখে শুনে যাক।"

উমা বলিলেন "আজই ডাক্তার ডাকবার কোন দরকার নেই দাদামণি, ভগবান করুন যেন দরকারও না হয়। মাথা আমি বেশ করে ধুইয়ে দিয়েছি, তাই ঘুমুতে পেরেছে।

আপনাকে তার জন্মে কিছু ভাবতে হবে না, আমি তার কাছে আছি। এতকাল তাকে এমনি করেই তো বুকে করে মানুষ করেছি দাদামণি—”

তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল।

ভবশঙ্কর ফিরিলেন বটে, কিন্তু শান্তি কিছুতেই পাইলেন না। পরিদিন প্রাতে উঠিয়াই তিনি পবিত্রের খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন, তাহার জ্বর সামান্য আধ ডিগ্রি কম পড়িয়াছে মাত্র, এখনও একশ চার ডিগ্রি জ্বর রহিয়াছে।

মাথায় হাত দিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

পবিত্রের জ্বর ছাড়িল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ভবশঙ্কর আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন “উমা—”

রুদ্ধকণ্ঠে উমা বলিলেন “দাদামণি, দেখছেন কি? আপনারই নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে ছেলে হারাতে বসেছেন। আপনার সমাজ বড় না আপনার ছেলে বড়, এইবার বলুন দাদামণি, এইবার একবার পবিত্রের মুখখানার পানে চেয়ে বলুন, আপনার ছেলের চেয়ে আপনার সমাজ বড়, তাই সমাজকে ত্যাগ কিছুতেই করতে পারবেন না, আর সেই সমাজের পায়ের তলায় তাই হাসতে হাসতে ছেলেকে বলি দিচ্ছেন। দাদামণি—”

বলিতে বলিতে উমা ক্ষুদ্রা বালিকার ন্যায় উচ্ছ্বসিতা হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ভবশঙ্কর মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অজ্ঞাতসারে কখন দুই ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

. বাহিরে আসিয়া দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন "বনমালী, সেখানে টেলিগ্রাম করে দাও বিয়ে হবে না, পবিত্রের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আর কলকাতায় গিয়ে আজই ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসা চাই। অর্থের দিকে চেয়ো না, যা লাগবে তাই দিয়ে দুজন বড় ডাক্তার নিয়ে এসো।"

তিনি পবিত্রের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন, অনুশোচনায় হৃদয় তাঁহার তখন পুড়িয়া যাইতেছিল।

১২

দিন যায় না যায় না করিয়াও দিন তো চলিয়া যাইতেছে। যত দিন যাইতেছে, পূরবী দাদামহাশয়ের অবস্থা দৃষ্টে ততই ব্যাকুলা হইয়া উঠিতেছে।

প্রথম প্রথম সে বুঝিতে পারিত না, দাদামহাশয় কেন তাহার সুমুখে ঔষধ খাইতে চান না, আড়ালে খাইতে চান; কিন্তু দুচার দিন না যাইতেই সে মূল সত্যকে অবিষ্কার করিয়া ফেলিল। দাদামহাশয় এক দিন চুপি চুপি জানালাপথে ঔষধ ফেলিয়া দিতেছিলেন, হঠাৎ সেই সময়ে পূরবী গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহা দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধ অপ্রস্তত হইয়া হাতখানা টানিয়া লইলেন।

"কি করছিলে দাদামশাই?"

দাদামহাশয় বিছানায় শুইয়া পড়িয়া হাঁফাইতেছিলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না।

অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে পূরবী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া বলিল "তোমাদের সবারই ইচ্ছে যাতে আমি পথে দাঁড়াই, তাই না? কেউ মুখে স্পষ্ট দূর দূর বলে তাড়িয়ে

দিলে, তুমি স্পষ্ট সেটা বলতে পারছ না, ভাবে প্রকাশ করছো।"

দাদামহাশয় তাহার হাতখানা ধরিয়া কাছে বসাইলেন —"আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি দিদি, মিথ্যে এ টাকা পয়সা ব্যয় করা হচ্ছে না কি? যে পাখী উড়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত, তোর এ ভাঙ্গা খাঁচায় কয়দিন সে আটকে থাকবে, তাই একবার বল দেখি ভাই? যাবার বেলায় এখন কোথায় যাতে শান্তিতে যেতে পারব তাই করবি, তা নয় যত ওষুধ বিশুধ এনে গেলাচ্ছিস। না দিদি, আর ওই তেত, টক ওষুধগুলো আমায় গেলাসনে, আমি আর খেতে পারব না।"

পূরবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, তাহারই অদৃষ্টের কথা। তাহারই বা অদৃষ্টে না আসিয়াছিল কি? সবার কেমন মা থাকে, তাহারও তেমনি মা ছিল, ভগবান মা দিয়া কাড়িয়া লইলেন, এমন করিলেন যে, মা নামটার উপর তাহার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার পর স্নেহময় দাদা-মশাই, তিল তিল করিয়া দিন দিন বুকের রক্ত তাহার বুকে ঢালিয়া যিনি তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, যাহার অসীম স্নেহ পাইয়া সে পিতার আদর মায়ের

স্নেহের অভাব কখনও অনুভব করিতে পারে নাই ; তাহার পরে দেবতুল্য স্বামী, রাজার মত শ্বশুর, সবই তো সে পাইয়াছিল। মেয়েরা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, সে আকাঙ্ক্ষা তাহার পূর্ণ হইয়াছিল, কোন পাপে তাহার সে সব গেল ? অবশেষে তাহার একমাত্র অবলম্বন দাদামহাশয়ও মহা-প্রস্থানের পথে পা বাড়াইলেন। কি পাপে—ওগো দয়াল ঠাকুর, একবার ডাকিয়া বলিয়া দাও, কি পাপে পূরবী সব পাইয়াও হারাইতে বসিয়াছে ? তাহার বড় ব্যথার সান্ত্বনা দিতে একটু কিছু রাখিলে না প্রভু ? এমন অদৃষ্ট দিয়াও তাহাকে পাঠাইয়া ছিলে গো ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পূরবী ডাকিল "দাদামশাই—"

"বড় শীত করছে ভাই, পায়ে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেও।"

কয় দিন অল্প অল্প জ্বরই চলিতেছিল, আজ প্রবল জ্বর আসিয়া পড়িল। পূরবী রাঁধাবাড়া ফেলিয়া রাখিয়া দাদামহাশয়ের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

বৈকালের দিকে যখন জ্বর কম পড়িয়া আসিল, বৃদ্ধ তখন চোখ মেলিলেন।

"তুই আজ খেয়েছিস্ পূরবী ?"

পূরবী মাথা কাত করিয়া বলিল "খেয়েছি দাদা।"

দাদামহাশয় যথাশক্তি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার বিশুষ্ক মুখখানা দেখিয়া লইলেন; তাহার হাতখানা শিথিল হস্তে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন "এ মিথ্যে কথা কেমন করে বললি ভাই পূরবী? তোর শুকনো মুখখানাই যে বলে দিচ্ছে তুই আজ কিছু খাসনি। আমার চোখে ধূলো দিতে চাচ্ছিস ভাই, সেটা সহজ হল না তো।"

পূরবী চুপ করিয়া রহিল।

দাদামহাশয় বলিলেন "আজ আমার একটু জ্বর বেশী হয়েছে বলে তুই খেলিনে পর্য্যন্ত, আচ্ছা পাগল মেয়ে তো তুই। যা—ভাত খেয়ে আয় ভাই, খেয়ে এসে বস। বিড়ালটাকে খেতে দিয়েছিস?"

পূরবী বলিল "তাকে খানিকটে দুধ খাইয়েছি দাদা।"

দাদা বলিলেন "তার পেটটা বুঝলি, নিজেরটা বুঝলিনে? নাঃ, তুই ভারি বিরক্ত করে তুললি আমাকে। ওঠ, যা পারিস চারটী খেয়ে আয় গিয়ে।"

পূরবী বলিল "আজ ভাত রাঁধিনি দাদা মশাই, থাক গিয়ে, একটা দিন বই তো নয়, খাবার খেয়ে কাটিয়ে দেব এখন।"

উৎকন্ঠিত দাদামহাশয় বলিলেন "খাবার খেয়ে কাটিয়ে

দিবি? দূর, তাও কি হয় রে? যা—ভাত রেঁধে আমার এই ঘরে এনে খাবি, নইলে কোনমতেই হবে না পূরবী; আমার দিব্য, আমি তোর হাত ধরছি, অমত করিস নে।"

তিনি হাত ধরিতেই পূরবীকে উঠিতে হইল।

আজ পূরবীকে আহার করানো চাই-ই। দেহের মধ্যে বড় যন্ত্রণা। জ্ঞানবান বৃদ্ধ বুঝিতে পারিতেছিলেন, প্রাণ পাখী উড়িয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। মায়ার বাধন সহজে কাটিতে পারিতেছে না, তাই ছটফট করিতেছে। নিজের নাড়ী নিজেই তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন, আর নাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এ কথাটা পূরবীকে তিনি এখনই বলিতে সাহস করেন নাই। এ বার্তা এখনই সে পাইবে, যাহা আসিতেছে তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, আগে আহারটা তার হইয়া যাক। ইহার পরে তাহার যাহা অদৃষ্ট-লিপি তাহা তো ফলিবেই, আজিকার দিনটা নারায়ণ, তাহার আহার পর্য্যন্ত রক্ষা কর।

মৃত্যু যন্ত্রণা কি, পূরবী তাহা জানে না, কখনও কাহারও মৃত্যুকালে সে উপস্থিত ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণা চাপিতে গিয়া দাদামহাশয়ের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল; ঝুঁকিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িয়া পূরবী বলিল "অমন করছো

কেন দাদামশাই, বুকটা বড্ড ব্যথা করছে কি? একবার ডাক্তার বাবুকে ডাকি দাদামশাই—?"

বিকৃত মুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া দাদামহাশয় বলিলেন, "না রে, ডাক্তার ডাকতে হবে না, কিছু যন্ত্রণা হচ্ছে না। তোর ভাত হয়েছে পূরবী?"

"এই হল দাদামশাই—"

দাদামহাশয় বলিলেন "একবার দেখে আয় দেখি হল কি না। বেশী করে জ্বাল দে, এখনই হয়ে যাবে এখন! কাঠের উনানে চড়িয়েছিস তো?"

পূরবী বলিল "হাঁ দাদামশাই।"

"তবে যা শিগগির—"

সে সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইবামাত্র দাদামহাশয়ের দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছু জানে না, সংসার যে এর কাছে এখনও অপরিচিত। মৃত্যুর নাম সে বারবার শুনিয়াই আসিয়াছে, মৃত্যু যে কি ভাবে আসে, কি ভাবে গ্রহণ করে, এ যে তাহা বিন্দুমাত্র অবগত নয়। নারায়ণ, শেষকালটায় কি এমনিই অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে প্রভু? তাঁহার যাইবার সময় উপস্থিত, বহুদিন হইতেই তো তিনি এই আহ্বানের প্রত্যাশায় আছেন। এই অভাগিনীর ব্যবস্থা সেই জন্যই

তো আগেই তিনি করিয়া দিলেন, কিন্তু কি করিলে নারায়ণ, তাহার সে আশ্রয় এমন করিয়া কাড়িয়া লইলে কেন? তাঁহার অন্তে সে দাঁড়াইবার স্থান এই বাড়ীখানি পাইবে, কিন্তু খাইবে কি? সামান্য যে টাকা তিনি পেনসান পাইতেন, তাঁহার অন্তে তাহা তো বন্ধ হইয়া যাইবে? হা নারায়ণ, তাহার অদৃষ্টে শেষের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ?

পূরবী তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া চলিয়া আসিল। সে খাওয়া নামেই মাত্র, দুই গ্রাস কোনও ক্রমে উদরে গেল মাত্র। আজ তাহার মনটা বড় বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, চারিদিক যেন হু হু করিতেছে, মনের কোন এক গোপন স্থান হইতে কে যেন আর্ত্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেছে, সব গেল রে, সব গেল।

এ পাশের বাসা ডাক্তার বাবুর; দাদামহাশয়ের নিকটে আগে না গিয়া সে ছাদের উপর চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, তিনি বাড়ীতেই আছেন। তাঁহাকে একবার এখনি পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়া সে নামিয়া দাদামহাশয়ের নিকট আসিল।

শেষ পথযাত্রী তখন তাহারই আগমন প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন, চোখ দুইটা তাঁহার দরজার উপরে পড়িয়াছিল। পূরবী প্রবেশ করিতেই ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "একটু জল দে ভাই, বড় তেষ্টায়—"

পূরবী তাড়াতাড়ি গ্লাসে জল ঢালিয়া তাঁহার মুখে দিতে গেল।

"এ কোন জল দিদি, কলের জল না গঙ্গাজল ?"

পূরবী উত্তর দিল "কলের জল দাদামশাই।"

দাদামহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন "কলের জল এখন আর দিসনে দিদি, গঙ্গাজল নিয়ে আয়, আমায় গঙ্গাজল দে।"

পূরবী গঙ্গাজল আনিয়া তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিল।

"আঃ, বড় তৃপ্তি রে, বড় তৃপ্তি পূরবী, আমার কাছে এসে বস ভাই, যাতে তোর মুখখানা দেখতে পাই তাই কর।"

উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে পূরবী বলিল "তুমি অমন করছ কেন দাদামশাই ?"

একটু হাসির রেখা মৃত্যু-মলিন মুখে ফুটিয়া উঠিল, "আর যে দেরী নেই রে ভাই, মরণ যে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, আমায় তার বুকে তুলে নিয়ে সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেবে বলে; আমি তার স্বরূপ আকার এইবার যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি রে ভাই।"

"দাদা—দাদা মশাই, আমি যে ডাক্তার বাবুকে ডেকে এলুম—"

শুষ্ক কণ্ঠ শুষ্ক নেত্র তাহার, আর যে জল আসিতেছে না। হায় ভগবান, পূর্ব্বেই নয়নের জল বহাইয়া দিয়াছ, আজ এই শুষ্কতা দান করিলে কেন? হৃদয় যে জ্বলিয়া যায়, এক বিন্দু বারি দাও, ওগো এক বিন্দু বারি দাও।

বৃদ্ধ হাঁফাইতেছিলেন। "আর ডাক্তারের দরকার কি দিদি? তুই ছেলেমানুষ, বুঝতে পারিসনি, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি সব। আমার নাড়ী ছেড়ে গেছে, আমার বুকের ভেতর বড় যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। আর বেশীক্ষণ নয় রে, যাবার সময় হয়েছে। উঃ, তোকে কোথায় রেখে চললুম রে, কার হাতে তোকে দিয়ে যাচ্ছি। পবিত্র—হায়—পূরবী—"

অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন, আর্ত্ত কণ্ঠে পূরবী ডাকিতে লাগিল "দাদা, দাদু, দাদামশাই।"

ডাক্তার আসিলেন, তখন শেষ মুহূর্ত্ত।

রোগী দেখিয়াই ডাক্তার যাইতে পারিলেন না, প্রতিবাসী বৃদ্ধের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হইল।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে বৃদ্ধের শেষ সময় আগত হইল। নিশ্চলা পূরবী মাথার কাছে বসিয়া।

শান্ত কণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, "অমন করে বসে থাকলে চলবে না মা, তুমি এই বিছানার এই দিকটা ধর, আমি ও-দিক ধরি, চল দুজনে বাইরে বার করি। তার পর যা করার আমি করব এখন।"

বিকৃত কণ্ঠে পূরবী বলিল "কিছু দরকার নেই বাবা, দাদামশাই তাঁর ঘরের ভেতরেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে যান। এই শেষকালটায় নাড়ানাড়ি করে, তাঁর যন্ত্রণাকাতর দেহকে আর যন্ত্রণা দিয়ে কি লাভ হবে বাবা?

"পূরবী—একবার হরিনাম—"

কথা বাহির হইতেছিল না, কিন্তু জ্ঞান তখনও সম্পূর্ণ ছিল।

রুদ্ধ কণ্ঠে পূরবী দাদামহাশয়ের কাণের কাছে মুখ লুইয়া গিয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে কখন বৃদ্ধের চোখ দুইটী চিরতরে মুদিয়া আসিল; শূন্য দেহখানা সংসারে পড়িয়া রহিল সাক্ষ্যস্বরূপ, প্রাণ অনন্তের পথে উধাও হইয়া গেল।

১৩

দুঃখ পাইয়া, বেদনা পাইয়া ভয় পাইয়া যে দাদামহাশয়ের স্নেহময় কোলে পূরবী লুকাইত, সে দাদামহাশয় আর নাই ; জগতে একটী মাত্র লোককে সে আপনার বলিয়া জানিয়াছিল, তাঁহাকেই জড়াইয়া ধরিয়া সে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, ছিন্নলতার মত পূরবী মাটীতে পড়িয়া রহিল।

দিন তবু বহিয়াই যাইতেছিল একটা দিনও থামিয়া রহিল না।

দিনের পর দিন গিয়া সপ্তাহ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গিয়া মাস, এমনি করিয়া মাসও বহিয়া যায় যে।

হা রে পতিতার মেয়ে, সব হারাইয়া জগতে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার আর কেন তোর? নিদারুণ রৌদ্র তাপে শুকাইয়া ওরে ফুল, তবু কেন আজও তুই বর্ত্তমান? ঝরিয়া মাটীতে পড়, একেবারে গুঁড়াইয়া যা, মাটীর সহিত মাটী হইয়া মিলিয়া যা।

কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, উদ্দেশ্য কিছুরই নাই, তবুও কেন বাঁচিয়া থাকা, কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনটাকে নিমেষে শেষ করিয়া ফেলা যায় না কি?

এ যে তাহার নিত্যকার ভাবনা, এক আধবারের ভাবনা তো নয়, এ যে তার চিরসাথী। ডাক্তারবাবু, তাঁহার স্ত্রী তাহার এই দুঃসময়ে মেয়ের মতই তাহাকে টানিতেছেন। তাঁহারা অভাগিনীর জীবনের সকল কথাই শুনিয়াছিলেন, মর্ম্মান্তিক দুঃখিতও হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই মেয়েটীকে ছোটবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহার পরিচয় ইঁহারা বেশ পাইয়াছিলেন।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ ডাক্তার বাবুর নূরপুর হইতে ডাক আসিয়াছিল, জমীদার পুত্রের সাংঘাতিক ব্যারাম, আজই যাওয়া চাই।

পূরবীকে তাঁহার স্ত্রী প্রত্যহ নিজের বাটীতে লইয়া যাইতেন, বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত নিজের বাড়ীতে তাহাকে যাইতে দিতেন না। সুন্দরী যুবতী সে, পাড়ায় মন্দ প্রকৃতির লোকেরও অভাব ছিল না।

পূরবীকে ডাকিয়া তিনি সংবাদটা দিবা মাত্র পূরবীর মুখখানা সাদা হইয়া গেল, দাঁড়াইতে অসমর্থা হইয়া সে বসিয়া পড়িল।

গম্ভীর মুখে ডাক্তার বলিলেন "অত ভেঙ্গে পড়ছো কেন মা, সাহস নিয়ে এসো। আমি যা বলি, তাই শোনো। যাবে আমার সঙ্গে সেখানে?"

আবার সেখানে—সেই সমাজের নিন্দা, ভবশঙ্করের তাড়না, এই কয় বৎসরের মধ্যে সে কথা সে তো একটুও ভুলিতে পারে নাই।

সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "না বাবা!"

ডাক্তার তেমনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "কেন যাবে না মা?"

"আর কি আমার সেখানে যাবার মত মুখ আছে বাবা, আজ কয় বছর আগে যা ঘটনা হয়ে গেছে, এখনও সে কথা আমার মনে যে জ্বলন্ত অক্ষরে আঁকা রয়েছে। সেই দূর দূর করে তাড়ানোর পরে আবার কোন মুখ নিয়ে সেখানে যাব বাবা?"

পূরবীর কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল।

ডাক্তার এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন "কিন্তু এও মনে কর মা, পবিত্র তোমার স্বামী, সে রোগশয্যায়। যে লোকটী আমায় খবর দিয়েছে, পাগলের মত আবল-তাবল বকে গেলেও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে অনেক খবর জেনে নিয়েছি। তোমার কাছে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সে হঠাৎ ছোট্ট ছেলের মত কেঁদে উঠে বললে—মাপ করবেন, মার কাছে আমি এ মুখ আর দেখাতে পারব না। ভগবান যদি দিন দেন, আমিই এসে

তাঁকে নিয়ে যাব, আর যদি পবিত্রের কিছু হয়, তাঁর সেখানকার সম্পর্ক সত্যিই উঠে যাবে, তাঁর আর সেখানে যেতে হবে না।"

পূরবী দুই হাতে ব্যথিত বক্ষ চাপিয়া ধরিল।

"বাবা—তাঁরই কথা থাকতে দিন। ভগবান যদি সেই সত্যিকার দিনটাই আমায় ফিরিয়ে দেন, তখন আমি যাব বাবা, আমার যাবার সময় এখনও হয়নি।"

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সত্যই পবিত্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া আসিতেছিল ; এখন তাহার পূর্ণ বিকার অবস্থা। বিকারের ঝোঁকে সে কেবল পূরবীকে ডাকিতেছিল, ক্ষমা চাহিতেছিল। শক্ত কাঠের মত ভবশঙ্কর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার নিজের কার্য্যফল দেখিতেছিলেন।

কলিকাতা হইতে দুইজন ডাক্তার আসিয়া পৌঁছাইলেন। প্রকাশ বোস যে সময় তাহাকে দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে পবিত্র ঘুমাইতেছিল।

সংযত কণ্ঠে প্রকাশ বোস বলিলেন "আপনি নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছেন ভবশঙ্করবাবু। আমার কথা শুনে রাগ করবেন না, আমায় অপরিচিত ভাববেন

না। আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু পবিত্র আমায় বেশ চেনে, আমিও তার জন্মে আপনাকে চিনেছি। ধর্ম্মের নাম করে অধর্ম্মকে আশ্রয় করেছেন, তার ফলেই আপনি দুইটী নর-নারী হত্যা করতে বসেছেন। আপনার ছেলেকে আপনি নিজের হাতে হত্যা করছেন, ভবশঙ্কর বাবু, কার জন্মে করছেন? সমাজের পানে চেয়ে, সমাজকে অক্ষত রাখতে আপনি যে নিজের সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভবশঙ্কর বাবু, আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম কি এতই অনুদার, এতই কুসংস্কারে ঢাকা? এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তো আগে এত সঙ্কীর্ণ ছিল না, আপনাদের মত সমাজপতির হাতে পড়ে এর কতই না দুর্দ্দশা হচ্ছে। সমাজ যাদের পেলে গৌরবান্বিত হতে পারত, তাদের আপনারা সমাজ হতে তাড়িয়ে দিচ্ছেন সামান্য একটা ত্রুটি ধরে, অন্য সমাজ তাদের বুকে পেয়ে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, এমনি করেই আমাদের সমাজ ভাল লোক হারিয়ে মন্দ লোককে বুকে ধরে যত রাজ্যের কুসংস্কার সমস্ত গায়ে জড়িয়ে মেখে বসে আছে। সমাজকে আপনি রক্ষা করতে গেলেন—পতিতার মেয়ে যেন সমাজে প্রবেশ লাভ করতে না পারে, কিন্তু সত্যিকার চোখ খুলে একবার দেখুন দেখি—এই

সমাজের বুকেই কত না জারজ সন্তান আছে, অথচ তারা বেশ সম্মানিত ভাবে দিন কাটাচ্ছে। যতক্ষণ না প্রকাশ হয় ততক্ষণ সে চলে যায়, আর প্রায়ই প্রকাশ হয়ও না। আর ধর্ম্মের দিক দিয়ে যদি বলেন, আপনার ধর্ম্ম কি তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেই হারিয়ে যাবে? ধর্ম্ম বলতে আপনি কি বোঝেন ভবশঙ্কর বাবু, আমি তাই আজ জিজ্ঞাসা করি? পাপের ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন, এই যে তুটি নর-নারী হত্যা করছেন নিজের হাতে, এ কি পাপ নয়? বাপ হয়েছেন কি একমাত্র স্নেহের সন্তানকে সমাজের কল্পিত ধর্ম্মের পায়ে বলি দেবার জন্যে? ছি ছি, এখনও আপনি চুপ করে ভাবছেন, সামনে ছেলে অনন্তের পথে যাত্রা করছে, তাকে শেষ নাম শুনাবেন তাই কি? বাপের উপযুক্ত কাজ শুধু এইটেই আপনার বাকি আছে করতে? আমার একমাত্র ছেলে যদি এ কাজ করতো ভবশঙ্কর বাবু, সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি আমার ছেলেকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতুম, কারণ সে যথার্থ মানুষের কাজ করেছে, একটা জীবনকে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেয় নি, জগতের সুখ আহ্লাদ ভোগ করবার অধিকার দিতে আপনার পাশে তাকে টেনে নিয়েছে। এমন মহৎ কাজ কয়জন করতে পারে ভবশঙ্কর বাবু। এ কাজ

করতে ধর্ম্ম হারাব না, ভগবান বিরূপ হবেন না, বরং তিনি আশীর্ব্বাদই করবেন।”

নির্ম্মম ভবশঙ্করের হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল, রুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি শুধু বলিলেন “ডাক্তার বাবু—”

প্রকাশ বোস উগ্রকণ্ঠ সংযত করিয়া বলিলেন “বুঝেছি, আপনার অনুতাপ হয়েছে। এখনও ছেলেকে বাঁচাতে পারবেন ভবশঙ্কর বাবু, আমায় আপনি আদেশ করুন আমি পূরবীকে এনে দেব, সে আমার বাড়ীতে আছে। আপনার শুভ-অদৃষ্ট তাই অমন মেয়েকে পুত্রবধূরূপে লাভ করতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন, গভীর আঘাত পবিত্রের বুকে, সে না এলে পবিত্রকে বাঁচাতে পারা যাবে না। যদি ছেলেকে বাঁচাতে চান, সত্যরূপে ভগবানকে পেতে চান, পতিতার মেয়ে বলে ঘৃণা না করে তাকে আনুন। সমাজ আপনার হাতে, সমাজ কিছু করতে পারবে না। আর যদিও কিছু বলে—বলতে দিন তাকে। যে সমাজ এত অনুদার সে সমাজে বাস করার চেয়ে ত্যাগ করা ভাল। দেবতা ঘুমিয়ে নেই, তিনি সদা জাগ্রত, তিনি আপনার কাজের ফলাফল বিচার করবেন। বলুন, আদেশ করুন, আমি পূরবীকে কাল সকালের মধ্যে এনে দিই।”

তাঁহার হাত দুখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সজল চোখে রুদ্ধকণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিয়া উঠিলেন "তাই করুন ডাক্তার বাবু, পূরবীকে এনে দিন। আমি যে মুখে মাকে আমার তাড়িয়েছি, সেই মুখে ফিরে তাকে ডাকতে পারছিনে, পুত্রকে বিসর্জ্জন দিতে বসেছি, তবু সঙ্কোচে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আপনি তাকে এনে দিন, আমার পবিত্রকে বাঁচান। পবিত্র ছাড়া আর আমার কেউ নেই ডাক্তার বাবু, পবিত্র—"

তাঁহার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

রাত্রের ট্রেনে ডাক্তার কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

১৪

শঙ্কিত বক্ষে কম্পিত পদে আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে পূরবী পাল্কী হইতে নামিল।

"বউ মা—"

বহুকাল পরে এ কাহার আদরের আহ্বান; পূরবী অবগুণ্ঠন তুলিয়া দেখিল সম্মুখে উমা।

"মা—"

উমার পদতলে সে লুটাইয়া পড়িল। উমা তাহাকে টানিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন, বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "এসেছিস মা, আয়। তোর ঘরে তুই ফিরে আয়, তোর সিঁথার সিঁদূরের জোরে পবিত্র আমার বেঁচে উঠুক মা।"

উচ্ছ্বসিত ভাবে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

সম্পূর্ণ নিরানন্দ পুরী, একটা উচ্চ কথা পর্য্যন্ত কাহারও মুখে নাই, সব চুপচাপ। পূরবীর প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিল, "কেমন আছেন মা তিনি?"

"কে, পবিত্র? দেখবি আয় মা—দেখবি আয়।"

সতের দিন অবিরত বিকারের ঝোঁকে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কাল সকাল হইতে পবিত্র নীরবে পড়িয়া

আছে। সে যে বাঁচিয়া আছে এটুকু জানা যাইতেছে শুধু তাহার মাথা নাড়াতে।

ভবশঙ্কর পুত্রের মাথার শিয়রে তেমনি আড়ষ্টভাবে বসিয়া। তাঁহার দত্ত ভীষণ আঘাত পুত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তবুও সে মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলে নাই, পিতৃদত্ত দণ্ড বুকে ধরিয়া নীরবে সে মৃত্যু বরণ করিতেছে। এ কি পিতার পক্ষে বড় কম পরিতাপের কথা যে, তিনি নিজেই পুত্র হত্যা করিলেন? ডাক্তার বলিয়াছেন বড় মন্দ নয়; একেবারে হত্যা করিলেই তো এর চেয়ে ভাল ছিল, তিনি যে তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে তুলিয়া দিলেন।

আজ যাইতেছে কাহার—তাঁহার না—সমাজের? বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কাহার?

ভগ্নকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন "পবিত্র—পবিত্র—"

কে উত্তর দিবে?

পবিত্র, বড় আদরের পবিত্র আমার, একবার চা বাবা, একবার কথা বলে যা বাবা, তোর চির অপরাধী চির পাতকী বাপকে মার্জ্জনা করে যা, এমন করে বুকের মধ্যে ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন করে যাসনে রে!"

উচ্ছ্বসিত ভাবে তিনি পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে

বুলাইতে পাগলের মত ডাকিতে লাগিলেন "ওরে, যে ভুল করেছি আমি তা সংশোধন করব, তোর বুকে যে ক্ষত উৎপন্ন করেছি আমি, তাতে আমিই শান্তির প্রলেপ দেব। পবিত্র, পবিত্র, আমার জীবনাধিক, একবার চেয়ে দেখ, তোর হতভাগা বাপের কথা শুনে যা। ওরে, তাকে এমনি করে আগুনের মধ্যে ফেলে যাস নে। হা নারায়ণ—"

মুক্তকণ্ঠে বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিলেন "আমি যা পাপ করেছি, তার শাস্তি আমায় অন্য রকমে দাও, পুত্রকে কেড়ে নিয়ো না, এমন করে আমার শেষ জীবনটা চিতার আগুনে ফেলে তিলে তিলে দগ্ধ করো না। দামোদর নিজের হাতে তোমায় পূজো করি, নিজের হাতে তোমায় তুলসী দেই, সে কি এই জন্যেই ঠাকুর, আমার একান্ত ভক্তির পুরস্কার কি এই দিচ্ছ তুমি? তবে কি তুমি যথার্থ-ই কিছু নও, সত্যিই কি তুমি পাথর মাত্র। যদি আমার পবিত্রের কিছু হয়, ওগো ঠাকুর, তোমায় যে হাতে আমি বাল্য হতে পূজা করে আসছি, সেই হাতে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলে দিয়ে আসব, যে মুখে তোমার প্রশংসা গান করেছি, সেই মুখে প্রচার করব, কিছু নেই, দেবতা নেই, ভগবান নেই। আমায় রক্ষা কর—তুমি যে যথার্থ আছ সে বিশ্বাস আমার ভেঙ্গো না নারায়ণ।"

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া উমা—ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। পূরবী শক্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখে একফোঁটাও জল আসিল না।

"দাদামণি—"

চমকাইয়া ভবশঙ্কর দ্বারের পানে চাহিলেন।

"দাদামণি, আপনার বউ মা এসেছে। পূরবী, এস বউ মা, এই ঘরে এস।"

আজ ভবশঙ্করের সম্মুখে অবগুণ্ঠন শূন্য মুখে দাড়াইল সে, আজ তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা ভবশঙ্করের চোখের সম্মুখে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। সে কাঁদে নাই, কাঁদিবার শক্তি তখন সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; তাহার মনোভাব স্পষ্ট তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা দেখিয়া ভবশঙ্করের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—আহা, বড় অভাগিনী।

"মা—বউ মা—"

এই প্রথম তাঁহার সম্বোধন, কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল "বস মা, এখানে বস। আজ তোমার বিষম পরীক্ষার দিন, মা; সাবিত্রী যেমন করে মরা স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন, তোমাকেও তেমনি করে আমার পবিত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে মা। আজ আমার পবিত্রকে যথার্থ-ই আমি তোমায়

দান করলুম। এত দিন প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারি না মা, এমন কি উমাকেও না, আজ তোমার হাতে তাকে দিলুম। দেখব—তুমি যদি যথার্থ সতী হও, আমার পবিত্রকে তুমিই কেবল ফিরাতে পারবে। আজ এই যায়গা তোমায় ছেড়ে দিয়ে আমি চললুম, কাল সকালে আমি যেন খবর পাই পবিত্রকে তুমি ফিরিয়েছ। এস মা—বস এখানে।"

জ্ঞানশূন্য বৃদ্ধ পূরবীর হাতখানা ধরিয়া পবিত্রের পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া শ্লথ পদে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সারা দিন রাত ঠাকুর ঘরে তাঁহার কাটিয়া গেল, অজস্র চোখের জলে ভাসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কেবল ডাকিতেছিলেন "ঠাকুর—বিশ্বাস হারাতে দিয়ো না, বিশ্বাস রাখ আমার, আমায় নরপিশাচ আকারে পরিবর্ত্তিত কর না নারায়ণ, আমি যা আমায় তাই কর।"

ডাক্তারেরা আজ এখানেই ছিলেন, কারণ আজিকার রাত্রিটাই অত্যন্ত সঙ্কটের। যদি আজিকার রাত্রিটা কোনও রকমে কাটাইয়া দেওয়া যায়, জানা যাইবে পবিত্র বাঁচিল।

সমস্ত রাত্রি উন্মুখ হইয়া অনিদ্রায় বৃদ্ধ কাটাইয়া দিলেন—ওই বুঝি কান্না শোনা যায়, ওই না উমা চীৎকার করিয়া উঠিল—পবিত্র—পবিত্র—

সকালের আলো গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কে সানন্দে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ভবশঙ্কর বাবু! তিনি কোথায়?"

কে উত্তর দিল "ঠাকুর ঘরে।"

ডাক্তার বোস রুদ্ধ-দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন "শিগগীর দরজা খুলুন ভবশঙ্কর বাবু, দেরী করবেন না।"

ক্ষিপ্রহস্তে দরজা খুলিতে খুলিতে ব্যগ্র পিতা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর ডাক্তার বাবু?"

"খবর ভাল, পবিত্র এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে, আর কোনও ভয় নেই—" সানন্দে ডাক্তার বোস ভবশঙ্করকে আলিঙ্গন করিলেন।

ভবশঙ্করের দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল—"সত্য কথা বলেছেন ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বোস বলিলেন "বাপের কাছে আমি ছেলের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলবার সাহস করি নে ভবশঙ্কর বাবু।"

"নারায়ণ—" ফিরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া রুদ্ধ কণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিলেন, "তুমি তবে সত্যই আজ দেবতা, বড় পরীক্ষাস্থলে ফেলেছিলে, কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেলেছিলুম, সন্দেহে মন দুলছিল। চিরাশ্রিত এ দাসকে এ পরীক্ষা করায় কি দরকার ছিল ভগবান? বুঝেছি প্রভু, মিথ্যা

ধর্ম্মের অহঙ্কার করতুম, সমাজের স্পর্দ্ধা করতুম, আমায় ধূলোর চেয়েও যে নত হতে হবে, আত্মমর্য্যাদায় স্ফীত হয়ে তা ভুলে গিয়েছিলুম, আঘাত দিয়ে আমায় সাবধান করে দিলে।"

অস্থির চঞ্চল পদে তিনি পবিত্রের গৃহে চলিলেন, সম্মুখেই হাস্যময়ী উমা।

ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পবিত্র ভাল হয়েছে উমা, জ্ঞান হয়েছে তার, কথা বলেছে?"

উমা বলিলেন, 'হ্যাঁ, সে এখন বেশ কথা বলছে।"

"বউ মা কোথায় উমা?"

উমা বলিলেন "বউ মা তার কাছে বসে আছে।"

"বউ মা—বউ মা—"

ভবশঙ্কর গৃহপ্রবিষ্ট হইবামাত্র পূরবী সরিয়া গিয়া এক-পাশে দাঁড়াইল।

পবিত্রের শান্ত হাসিমাখা মুখের পানে চাহিয়া বৃদ্ধ ভবশঙ্কর হৃদয়ে অসীম বল পাইলেন,—পূরবীর দুখানা হাত দুটী হাতের মধ্যে লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "মা লক্ষ্মী, সত্যিই তুই সতী, তাই সাবিত্রীর মত মরা স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিস্, পবিত্রকে আবার দেখতে দিয়েছিস। মা, পাঁচ বছর আগে কি করেছি, কি বলেছি,

সে সব ভুলে যা, আজ আমার গৃহকে তুই পূর্ণ করে রাখ মা, তোর হাসিতে আমার গৃহ ভরে উঠুক। পবিত্রকে আমি তোকে দান করেছি, ওর ওপরে অধিকার এখন একা তোর, আশীর্ব্বাদ করছি মা, তুই চিরায়ুষ্মতী হয়ে থাক।"

সজল নেত্রে পূরবী তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। আজ এই বিপুল আনন্দের মাঝখানে তাহার সারাবক্ষখানা জুড়িয়া একটা ব্যথা জাগিয়া উঠিল—দাদামশাই, দাদু, আজ এই মিলনের দিনে কোথায় তুমি ?

বৃদ্ধ এ মিলন দেখিতে পাইলেন না, এ বড় ক্ষোভের কথা। তাঁহার পূরবী যখন আবার সব ফিরিয়া পাইল তখন তিনি পরলোকে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার পরলোকগত আত্মাই এই মিলন ঘটাইয়া দিয়াছে। পূরবীর জন্ম তিনি জীবন্তে সুখী হইতে পারেন নাই, মরিয়াও শান্তি পান নাই। তাঁহার আত্মা এবারে যথার্থই মুক্তিলাভ করিল।

সমাপ্ত

কাঞ্চনমালা (২য় সং)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।

বিবাহ-বিপ্লব (৩য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

চিত্রালী (১০ম সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।

বড়বাড়ী (১১শ সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

অরক্ষণীয়া (৯ম সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ময়ূখ (৩য় সং)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।

রূপের বালাই (৪র্থ সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

লাইকা (২য় সং)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

আলেয়া (২য় সং)—শ্রীনিরুপমা দেবী।

বেগম সমরু (২য় সং)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নকল পাঞ্জাবী—(ষষ্ঠ সং)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

হালদার বাড়ী (২য় সং)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী।

মধুপর্ক (২য় সং)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চন্দ্রনাথ (১৩দশ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুখের ঘর (৫ম সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

মধুমল্লী (৩য় সং)—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

অভাগী (দ্বিতীয় খণ্ড)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

বাঙ্গালীর খাদ্য—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নব্য-বিজ্ঞান (২য় সং)—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ।

নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী বি-এ।

হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।

জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শয়তানের দান (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ-পরিবার (২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

নিষ্কৃতি (৫ম সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হরিশ ভাণ্ডারী (৫ম সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

কোন্ পথে (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।

পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ।

পল্লীরাণী (৩য় সং)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভবানী—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল।

দ্বিতীয় পক্ষ (২য় সং)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

ইংরাজী কাব্যকথা—আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ।

কাল বৌ (৩য় সং)—মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ছবি (৪র্থ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মনোরমা (২য় সং)—শ্রীমতী সরসীবালা বসু।

সুরেশের শিক্ষা (২য় সং)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নাচওয়ালী (২য় সং)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ।

প্রেমের কথা (২য় সং)—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

গৃহহারা (২য় সং)—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেওয়ানজী (২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

কাঙ্গালের ঠাকুর (৩য় সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

আয়ুষ্মতী (৩য় সং)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

গৃহদেবী (৩য় সং)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

হৈমবতী—৺চন্দ্রশেখর কর।

বোঝাপড়া (২য় সং)—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

গৃহ-কল্যাণী (২য় সং)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

সুরের হাওয়া (২য় সং)—প্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি।

প্রতিভা—শ্রীবরদাকান্ত সেনগুপ্ত।

আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি-এল।

লেডী ডাক্তার (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

পাখীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ।

মহাশ্বেতা —শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল।

বাজীকর (২য় সং)—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

আকাশ কুসুম—শ্রীনিশিকান্ত সেন।

আহুতি—শ্রীসরসীবালা বসু।

অন্ধা (২য় সং)—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

মণ্টুর মা—শ্রীচরণ দাস ঘোষ।

রক্তের ঋণ (৩য় সং)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-ডি-এল।

ছোড়দি (২য় সং)—বিজয়রত্ন মজুমদার।

মোহিনী—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।

সুরের মায়া—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনন্দ মন্দির (২য় সং)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ।

চিরকুমার (২য় সং)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ।

প্রজাপতির দৌত্য—শ্রীঅজয়কুমার সেন।

সাধে-বাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ঋণমুক্তি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এস-সি।

গ্রহের ফাঁদ—সরসীবালা বসু।

গরীব (২য় সং)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

বাজীওয়ালী—শ্রীসুষমা সিংহ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা